Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতিমা ইয়াছমিন

রোলঃ 23090120962

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতিমা ইয়াছমিন

রোলঃ 23090120962

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাতিমা ইয়াছমিন, আইডিঃ 23090120962 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

ফাতিমা ইয়াছমিন

আইডিঃ 23090120962

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

সাহাবায়ে কেরামের সংজ্ঞা ও পরিচয় 6

সাহাবীদের সংখ্যা ও শ্রেণিবিন্যাস 7

কুরআনে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা 11

হাদীসে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা 16

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার অনন্যতা 19

সাহাবীদের মর্যাদাগত বিভিন্ন স্তর 24

সাহাবায়ে কিরামের অনন্য বৈশিষ্ট্য 36

কতিপয় সাহাবাদের অনুপম জীবনচিত্র 51

ইসলামী ইতিহাসে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদাপূর্ণ অবদান 71

সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে সমালোচনা না করার বিধান 74

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা অবমাননার পরিণতি ও 77

আধুনিক যুগে এর প্রভাব 77

মুশাজারাতে সাহাবা 80

শেষ কথা 81

তথ্যসূত্র (রেফারেন্স) 83

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার জন্য যিনি সৃষ্টিকুলের, সমস্ত জগতের পালনকর্তা ও হুকুমদাতা যিনি নভোমন্ডলে যা আছে এবং ভূমন্ডলে যা আছে সব কিছুর মালিক যিনি তাঁর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণের প্রতীক ও রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন অতঃপর লাখো-কোটি দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এর উপর যিনি সমগ্র মানবতার রাসূল ও রাহবার।

ইসলাম মানবজীবনের সর্বাঙ্গীন দিকনির্দেশনা প্রদানকারী এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এই ইসলামের প্রচার, সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নবী করিম ﷺ -এর পর যাদের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, তাঁরা হলেন সাহাবায়ে কেরাম (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)। তাঁরা নবী করিম ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করে তাঁর কাছ থেকে সরাসরি দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ করেন, দ্বীনকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে বিশুদ্ধ ইসলাম পৌঁছে দেন।

সাহাবায়ে কেরাম (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) নবী করিম ﷺ-এর শ্রেষ্ঠ অনুসারী। তাদের জীবন, চরিত্র, ত্যাগ, আনুগত্য এবং নৈতিক শিক্ষা মুসলিম উম্মাহর জন্য আজও অনন্য প্রেরণা। ইসলামের ইতিহাসে তারা ঈমান, ত্যাগ ও দাওয়াহর নিদর্শন।

সাহাবায়ে কেরাম শুধু ইতিহাসের চরিত্র নন, বরং তারা মুসলিম উম্মাহর আদর্শ। কুরআন ও হাদীসে তাঁদের মর্যাদা, স্থান ও শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্টভাবে উল্লেখিত। কিন্তু আধুনিক যুগে কিছু বিভ্রান্ত মতবাদ তাঁদের মর্যাদা খাটো করার চেষ্টা করছে; এজন্য মুসলিম সমাজের দায়িত্ব হলো—সাহাবায়ে কেরামের প্রকৃত মর্যাদা জানানো ও তাঁদের সম্মান রক্ষা করা।

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা বিষয়টি শুধুমাত্র ঐতিহাসিক বা আবেগিক নয়, বরং এটি আকীদাহভিত্তিক একটি বিষয়। কারণ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ অনুযায়ী সাহাবীদের সকলকে ভালোবাসা, তাঁদের সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং তাঁদের বিতর্কে নিরব থাকা ঈমানের অংশ।

সাহাবায়ে কেরামের সংজ্ঞা ও পরিচয়

সাহাবায়ে কেরাম (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُم) হলেন ইসলামের প্রথম প্রজন্ম, যাঁরা নবী করিম ﷺ -এর সাহচর্য লাভ করেছেন, তাঁর কাছ থেকে দ্বীনের জ্ঞান গ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সেই দ্বীনকে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁরা হলেন সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ, যাদের মাধ্যমে ইসলাম সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তৃত হয়েছে। তাঁদের অবস্থান নবী-রাসূলদের পরেই, এবং তাঁরা উম্মাহর সর্বোত্তম শ্রেণি।

সাহাবী শব্দের সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ:

“সাহাবী” (صَحَابِيّ) শব্দটি এসেছে আরবি “صُحْبَة” থেকে। একবচনে 'সাহাবী' (صحابي) এবং বহুবচনে ‘সাহাবাতুন’ (صحابة) ও 'আসহাব' (اصحاب) ব্যবহৃত হয়। সাহাবী (صحابي) শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ হল 'সাহাবিয়া' (صحابية) অর্থ নারী সাহাবী।

আভিধানিক অর্থ সঙ্গী, সাথী, বন্ধু, অনুসারী, সহচর।

(খ) পারিভাষিক অর্থ:

ইমাম ইবনে হাজর আল-আসকালানী (রহ.) বলেন:

الصَّحَابِيُّ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنَابِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ

“যে ব্যক্তি ঈমানদার অবস্থায় নবী করিম ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন তিনিই সাহাবী।” [আল-ইসাবা, ১/৭]

'নবীজি ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তাঁকে রাসূল মেনে' এবং 'মুসলিম হিসাবে মৃত্যু'র শর্তের কারণে প্রিয় নবী ﷺ-এর 'সাহাবী' হিসাবে বিবেচিত হবেন–

এক- যাঁরা দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে ওঠা-বসা করেছেন।

দুই- যাঁরা অল্প কিছুদিন তাঁর সাহচর্য পেয়েছেন।

তিন- যাঁরা মোটেও সাহচর্য পাননি, (কিন্তু উপরোক্ত শর্তে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন)

চার- যাঁরা তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন বা করেননি।

পাঁচ- যাঁরা তাঁর সঙ্গে জিহাদে শরীক হয়েছেন বা হননি।

ছয় - যাঁরা উপরোক্ত শর্তে একবারমাত্র তাঁকে দেখেছেন।

সাত- দৃষ্টিশক্তিহীনতার কারণে যিনি তাঁকে চোখের দেখা দেখতে পাননি। তাঁরা সকলেই সাহাবী।

পক্ষান্তরে কাফের অবস্থায় তাঁর সাক্ষাৎপ্রাপ্ত ব্যক্তি সাহাবী নয়। এমনকি পরিবর্তীতে ঈমান

এনেও তিনি সাহাবী হতে পারবেন না যদি পুনরায় তাঁর সাক্ষাৎ না পান। কারণ 'সাহাবী' হতে হলে মুমিন হিসাবে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ জরুরি। নবীজি ﷺ-এর সঙ্গে ঐ ব্যক্তির ঈমান গ্রহণের পর আর সাক্ষাৎ হয়নি। একইভাবে 'সাহাবী' বিবেচিত হবেন না আহলে কিতাবের সেই মুমিন ব্যক্তিও যিনি নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে প্রিয় নবী ﷺ-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। কারণ 'নবীজি ﷺ-কে রাসূল মেনে তাঁর সাক্ষাৎ...' এর শর্ত এই ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায়নি। আবার যে ব্যক্তি নবীজি ﷺ-কে রাসূল মেনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে কিন্তু পরে মুরতাদ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে (নাউযুবিল্লাহ), সেও 'সাহাবী' নয়–মুসলিম হিসাবে মৃত্যুর শর্তের কারণে। তবে যেই ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যাওয়ার পর মৃত্যুর পূর্বেই আবার ইসলামে ফিরে এসেছেন। তিনি বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মতে প্রিয় নবী ﷺ-এর সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ না হলেও সাহাবী হিসেবে পরিগণিত।

[আল-ইসাবা ফি তামইযিস সাহাবা, ১/৭-৯]

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর সাথে সামান্য সময়ের জন্য হলেও সাক্ষাৎ করেছেন এবং ঈমান এনেছেন, তিনি সাহাবী হিসেবে গণ্য হবেন। আর যারা নবীজি ﷺ-এর জামানায় ঈমান আনলেও তাঁকে দেখেননি এবং তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেননি, তাঁরা সাহাবী নন। একইভাবে যাঁরা নবিজির সাক্ষাৎ পেয়েছেন; কিন্তু তখন ঈমান আনেন নি, ঈমান এনেছেন নবীজি ﷺ-এর ওফাতের পরে, তাঁরা সাহাবী নন।

সুতরাং মুনাফিক ও মুরতাদদের সাহাবী বলার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, মুনাফিকরা প্রকৃত ঈমানই আনেনি আর মুরতাদদের অন্তিম অবস্থা ছিল কুফর। আর কর্মের ক্ষেত্রে শেষ পরিণতিই বিবেচ্য। এ কারণে সংজ্ঞার মধ্যে ঈমানের ওপর মৃত্যুবরণ করার কথাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সাহাবীদের সংখ্যা ও শ্রেণিবিন্যাস

সাহাবীদের সংখ্যা

সাহাবীদের সংখ্যা যে কত তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। ইমাম আবু যারআ আর-রাযী বলেছেন, রাসূল ﷺ-এর যখন ইনতিকাল করেন, তখন যারা তাঁকে দেখেছেন এবং তাঁর কথা শুনেছেন এমন লোকের সংখ্যা নারী-পুরুষ মিলে এক লাখেরও ওপরে। তাঁদের প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাহলে যে সকল সাহাবী কোন হাদীস বর্ণনা করেননি তাঁদের সংখ্যা যে কত বিপুল তা সহজেই অনুমেয়। আবু যারআর

একথার সমর্থন পাওয়া যায় বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত কা’ব ইবন মালিকের একটি বক্তব্য দ্বারা। তিনি তাবুক অভিযান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন,
‘‘মানুষের সংখ্যা অনেক। কোন দফতর বা দিওয়ান তা গণনা করতে পারবে না।’’

সাহাবীদের যথাযথ হিসেব কোনভাবেই সম্ভব নয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের শেষ দিকে মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর হাতে বাইয়াত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, হিজরী দশম সনে মক্কা এবং তায়েফে একজনও অমুসলিম ছিল না। সকলে ইসলাম গ্রহণ করে বিদায় হজ্জে অংশগ্রহণ করে। এমনিভাবে আরবের বহু গোত্র সম্পূর্ণরূপে মুসলমান হয়ে যায়। তাদের অধিকাংশ ছিল মরুবাসী। তাদের হিসেব সংরক্ষণ করা কোনভাবেই সম্ভব ছিলনা। তাছাড়া হযরত আবু বকর (রদ্বিয়াল্লাহু তা’’আলা আনহু)-এর খিলাফতকালে ভণ্ড নবী ও ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযানকালে অসংখ্য সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। তাঁদের অনেকের পরিচয়ও ধরে রাখা সম্ভব হয়নি।
সাহাবিদের সঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও, বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যে তাদের সংখ্যা লক্ষাধিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জনপ্রিয় মত অনুসারে, সংখ্যাটি ১,১৪,০০০ থেকে ১,২৪,০০০ এর কাছাকাছি।
সাহাবীদের সংখ্যা যতই হোক, তাঁদের মর্যাদা ও অবদান কোনো সংখ্যার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁরা ছিলেন কুরআন ও সুন্নাহর প্রথম বাহক, দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রথম শ্রেণির সৈনিক। তাঁরা ছিলেন দ্বীনকে রক্ষা ও পৌছে দেওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম, যাদের আত্মত্যাগের ফলেই আজ আমাদের কাছে ইসলামের নিখুঁত বার্তা পৌঁছেছে।

সাহাবায়ে কেরামের শ্রেণি

উলামায়ে কেরাম সাহাবীদের বারোটি স্তর ও শ্রেনী আলোচনা করেছেন। কেউ কেউ বেশিও বলেছেন, মুহাম্মাদ ইবনে সাআদ বলেছেন পাঁচটির কথা। সাহাবায়ে কেরাম রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুমের ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতা, হিজরত এবং জিহাদের ময়দানে অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিবেচনায় যে বারোটি স্তর করা হয়েছে, নিচে সংক্ষেপে তার বিবরণ তুলে ধরা হলো:
১. প্রথম স্তরের সাহাবীগণ হলেন যাঁরা মক্কায় একেবারে শুরুতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যেমন: আবু বকর, উমার, উসমান ও আলী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুম।

২. দ্বিতীয় স্তরের সাহাবীগণ হলেন দারুন নাদওয়ায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ। আর এটা হলো উমার ইবনুল খাত্তাব রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, তখন তাকে দারুন নাদওয়ায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর তিনিসহ মক্কাবাসীর মধ্য থেকে একদল সাহাবী নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাই'আত গ্রহণ করেন।
৩. আর তৃতীয় স্তরের সাহাবীগণ হলেন ঐসব মুহাজির সাহাবী, যাঁরা হাবশায় হিজরত করেছেন।
৪. আর চতুর্থ স্তরের সাহাবীগণ হলেন যাঁরা 'আকাবা নামক স্থানে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শপথ গ্রহণ করেছেন।
৫. আর পঞ্চম স্তরের সাহাবীগণ হলেন যাঁরা 'আকাবার দ্বিতীয় শপথ অনুষ্ঠানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে শপথ গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের অধিকংশ ছিলেন আনসার সাহাবী।
৬. আর ষষ্ঠ স্তরের সাহাবীগণ হলেন সেসব মুহাজির, যাঁরা মদীনায় প্রবেশ ও মসজিদ বানানোর পূর্বে 'কুবা' নামক স্থানে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছেছেন।
৭. আর সপ্তম স্তরের সাহাবী হলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ, যাঁদের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন এবং তিঁনি ঘোষণা দিয়েছেন যে, তোমরা যা ইচ্ছা করতে পার। নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।” (সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৪২৭৪)
৮. আর অষ্টম স্তরের সাহাবী হলেন ঐসব মুহাজির সাহাবীগণ, যাঁরা বদর যুদ্ধ ও হুদায়বিয়ার সন্ধির মধ্যবর্তী সময়ে মদীনায় হিজরত করেছেন।
৯. আর নবম স্তরের সাহাবীগণ হলেন যারা বায়'আতে রিদ্বওয়ানে অংশগ্রহণ করেছেন, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا.

“অবশ্যই আল্লাহ মুমিনগণের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার কাছে বাই'আত গ্রহণ করেছিল, অতঃপর তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি জেনে নিয়েছেন। ফলে

তিনি তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয়ে পুরস্কৃত করলেন।" [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ১৮]
আর বায়'আতে রিদ্বওয়ান অনুষ্ঠিত হয়েছিল হুদায়বিয়া নামক স্থানে, যখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার কাফির কর্তৃক ওমরা পালনে বাধাগ্রস্ত হয়েছিলেন।
১০. আর দশম স্তরের সাহাবী হলেন ঐসব মুহাজির সাহাবীগণ, যারা হুদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ে মদীনায় হিজরত করেছেন। তাদের মাঝে অন্যতম হলেন খালিদ ইবন ওয়ালিদ, 'আমর ইবনুল 'আস, আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুম প্রমুখ এবং এ স্তরের সাহাবীগণের সংখ্যা অনেক।
১১. আর একাদশ স্তরের সাহাবীগণ হলেন যারা মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যাদের মধ্যে কুরাইশ গোত্রের একটি বড় দল সামিল ছিলো।
১২. আর দ্বাদশ স্তরের সাহাবীগণ হলেন ছোট্ট শিশু-কিশোর কম বয়সীদের মধ্য থেকে যারা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন মক্কা বিজয়ের দিন, বিদায় হজের দিনসহ বিভিন্ন সময়ে এবং তাদেরকে সাহাবীগণের মধ্যে গণ্য করা হয়। যাদের মাঝে ছিলেন সায়েব ইবনে ইয়াযীদ, আবদুল্লাহ ইবনে সালাবা—এরা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এলে তিঁনি তাদের দু'জনের জন্য দুআ করেছিলেন, তাদের মাঝে আরও ছিলেন, আবুত তুফাইল আমের ইবনে ওয়াসেলহ এবং আবু জুহাইফা ওয়াহাব ইবনে আবদুল্লাহ। তারা দু'জন প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাওয়াফের সময় এবং যমযমের নিকট দেখেছিলেন।

আবার মোটামুটিভাবে সাহাবীগণের স্তরকে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যাসের বিষয়টিও প্রসিদ্ধ:
প্রথম স্তর: বড় বড় সাহাবীগণের স্তর। যেমন, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জন এবং প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীগণ।
দ্বিতীয় স্তর: মধ্যম স্তরের সাহাবীগণ।
তৃতীয় স্তর: ছোট স্তরের সাহাবীগণ, যারা বিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন অথবা যারা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে ছোট ছিলেন।
উল্লেখ্য যে, সাহাবায়ে কেরামকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে এবং তাদের মান-মর্যাদার মাঝেও তারতম্য রয়েছে, যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত; কিন্তু তারা সকলেই যে ন্যায়পরায়ণ এবং নবীগণের পরেই তারা যে দুনিয়ার ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কুরআনে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

আল-কুরআনুল কারীম মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা, যেখানে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের গুণাবলি, নবী-রাসূলদের আদর্শ এবং তাঁদের সাথীদের মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম (رَضِيَ اللهُ عَنْهُم) হলেন সেই নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ, যাদের সম্পর্কে কুরআনে বারবার প্রশংসা করা হয়েছে।

কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা, ঈমান, ত্যাগ, জিহাদ ও নবী ﷺ-এর প্রতি আনুগত্যকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এবং তাদের জন্য জান্নাতের শুভসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রশংসা করেছেন, সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছেন এবং পরবর্তী প্রজন্মকে তাঁদের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

কয়েকটি আয়াত, তরজমা ও ব্যাখ্যা তুলে ধরা হচ্ছে যা সাহাবীদের মর্যাদা প্রমাণ বহন করে।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

“তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, যাদেরকে মানুষের (কল্যাণ ও সংশোধনের) জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।” [সূরা আ-লি 'ইমরান: ১১০]

২। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন–

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

“আমি তোমাদের বানিয়েছি এমন একটি দল যারা (সকল দিক বিবেচনায়) অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ নীতি, আর্দশ ও কর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেন তোমরা বিরোধী লোকদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হতে পারো।” [সূরা বাকারা : ১৪৩]

উভয় আয়াতের আসল সম্বোধন সাহাবায়ে কেরাম। তাঁরাই এর প্রথম মেছদাক (লক্ষ্যস্থল)। নিজ নিজ আমল অনুসারে উম্মতের অন্য সকলেও তাতে অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আয়াত দুটোর প্রকৃত লক্ষ্য সাহাবায়ে কেরাম, এটা সকল মুফাসসির ও মুহাদ্দিসের ঐক্যমতে প্রমাণিত। আয়াত দুটোতে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে সকল মানুষের মাঝে সাহাবায়ে কেরামই সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম, ন্যায়নিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য। আল্লামা সাফারীনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আম্বিয়ায়ে কেরামের পরে সাহাবায়ে কেরামই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, এটাই জমহুর (সকল) উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।

ইবরাহীম ইবনে সাঈদ জওহারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি হযরত আবু উমামা রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞাসা করলাম, সাহাবী হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং তাবেঈ উমার ইবনে আবদুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহির মধ্যে কে উত্তম। তিনি জবাব দিলেন-

لَا تَعْدِلُ بِأَصْحَابِ محمد صلى الله عليه وسلم أَحَدًا (الروضة الندية لابن تيمية ٤,٥)

'আমরা মনে করি না যে, কোনো মানুষের পক্ষে সাহাবীদের সমকক্ষ হওয়া সম্ভব, উত্তম হওয়া তো দূরের কথা।'

৩। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ

" অবশ্যই আল্লাহ মুমিনগণের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার কাছে বাই'আত গ্রহণ করেছিল।"

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন।" [সূরা আল-ফাতহ : ১৮ ও ২৯]

সাধারণ মুফাসসিরীন-সহ ইমাম কুরতুবী বলেন, 'তাঁর সহচরগণ' এর মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের গোটা জামাতই অন্তর্ভুক্ত। এতে সকল সাহাবীর ন্যায়নিষ্ঠতা, তাঁদের হৃদয় ও মনের পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা এবং তাঁদের সম্পর্কে ব্যাপক প্রশংসার বাণী ঘোষিত হয়েছে স্বয়ং জগতসমূহের স্রষ্টা মহান রাব্বুল আ'লামীনের পক্ষ থেকে।

আবু উরওয়াহ যুবাইরী বলেন, একদিন আমি ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহির মজলিসে উপস্থিত ছিলাম, সেখানে লোকজন এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন, লোকটি সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করে এবং তাঁদেরকে মন্দ বলে থাকে। একথা শুনে ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত আয়াতের অংশ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ (অর্থ : যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন) তেলাওয়াত করে বললেন, যেই ব্যক্তির অন্তরে প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সাহাবীর ব্যাপারে বিদ্বেষ থাকবে, সে এই আয়াতের শাস্তি পাবে। অর্থাৎ তার ঈমান বিপদজনক অবস্থায় পড়ে

যাবে। কেননা আয়াতের মধ্যে কোনো সাহাবীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকে কাফেরদের আলামত আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৪। অপর জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ

"আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত ঝরনাসমূহ" [সূরা তাওবা : ১০০]

এখানে সাহাবায়ে কেরামের দুটো স্তরের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, এক. অগ্রগামী প্রথম ও পুরাতন (সাবেকীনে আওয়ালীন) দুই. পরবর্তীতে ঈমান গ্রহণকারী। উভয়স্তরের সাহাবীদের সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে-

'তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ তা'আলার প্রতি পরিপূর্ণরূপে তুষ্ট। তাদের জন্য অনন্তকালের জান্নাত নির্ধারিত' সকল সাহাবীই এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। মুহাজিরীন ও আনসার সাহাবীদের চেয়ে সাবেকীনে আওয়ালীন (অগ্রগামী প্রথম পুরাতন) আর কারা?

'সাবেকীনে আওয়ালীনে'র ব্যাখ্যা: প্রথম ব্যাখ্যা-হযরত আবু মূসা আশআরী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, ইবনে সীরীন ও হাসান বসরী প্রমুখের। তাঁদের বক্তব্যের সারকথা এই যে, বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে বাইতুল্লাহর দিকে কেবলা পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছিল হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে। এই ঘটনার পূর্বেই যারা ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবী হওয়ার অনন্য গৌরব লাভ করেছিলেন তাঁরাই সাবেকীনে আওয়ালীন (অগ্রগামী প্রথম ও পুরাতন)। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা-ইমাম শাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, হিজরতের ৬ষ্ঠ বর্ষে সঙ্ঘটিত 'বাইয়াতে রিদ্বওয়ানে' যাঁরা শরীক হয়েছিলেন, তাঁরাই 'সাবেকীনে আওয়ালীন' (অগ্রগামী প্রথম ও পুরাতন) হিসাবে গণ্য।

'সাবেকীনে আওয়ালীনে'র যে ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হোক অর্থাৎ, উভয় কেবলার দিকে নামায আদায়কারী সাহাবী হোন অথবা বাইয়াতে রিদ্বওয়ানে অংশগ্রহণকারী হোন, তাঁদের পরেও 'সাহাবী'র গৌরব অর্জনকারীদের সকলকেই আল্লাহ তা'আলা وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ (এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে) অংশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের সকলের জন্যেই নিজের পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের চিরস্থায়ী পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন।

৫। অন্য ২টি সূরায় আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى.

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ.

"বলো, সকল প্রশংসাই আল্লাহর এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাগণের প্রতি।

অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করেছি তাদের, যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি, তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে, এটা মহা অনুগ্রহ।"

[সূরা আন্-নামল: ৫৯, সুরা ফাতির ৩২]

উক্ত দুই আয়াতেই সাহাবায়ে কেরামকে মনোনীত বান্দা বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। পরে তাঁদেরই একটি শ্রেণি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী'। এতে বুঝা যায় সাহাবায়ে কেরামের কারও দ্বারা যদি কখনো কোনো গুনাহ হয়েও থাকে, তবে তা ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। না হলে তাদেরকে 'মনোনীত বান্দা'র মধ্যে উল্লেখ করা হতো না।

কুরআনের প্রথম অধিকারী সাহাবায়ে কেরাম, কুরআনের সুস্পষ্ট ভাষ্য মতে তাঁরা আল্লাহ তাআলার 'মনোনীত বান্দা'। আর প্রথম আয়াতে সেই মনোনীত বান্দাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম এসেছে। এভাবে সকল সাহাবীই মহান সৃষ্টিকর্তার এই সালামের মধ্যে শামিল রয়েছেন।

৬। সূরা হুজুরাতে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

"কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানের মুহাব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী, এটা আল্লাহর কৃপা ও নেয়ামত, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

[সূরা হুজুরাত ৭-৮]

এই দুই আয়াতে সকল সাহাবী সম্পর্কে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের অন্তরে ঈমানের প্রতি ভালোবাসা এবং কুফর, পাপাচার ও গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

৭। সূরা আল-হাশরের কিছু অংশে–

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ... وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَان ...
...وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

অর্থ: "(এ সম্পদ) তাদের জন্য, যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পদ ত্যাগ করেছে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য... এবং তাদের জন্য, যারা আগে ঈমানে অগ্রসর ভাইদের জন্য দোয়া করে বলে: 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সেই ভাইদের ক্ষমা কর, যারা ঈমানে আমাদের আগে অগ্রসর হয়েছে।" [সূরা আল-হাশর: ৮–১০]

৮। সূরা আনফালের ২টি আয়াত–

(ক) সূরা আনফাল, আয়াত ৬৪

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থ: "হে নবী! আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং যারা আপনার অনুসারী মুমিন, তারাও।" [সূরা আনফাল: ৬৪]

এখানে আল্লাহ তা'আলা নবী ﷺ-এর পর সাহাবীদেরকেই তাঁর দাওয়াত ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার সহযোগী হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

(খ) সূরা আনফাল, আয়াত ৭৪

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا

অর্থ: "যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে — তারাই প্রকৃত মুমিন।" [সূরা আনফাল: ৭৪]

এই আয়াতে সাহাবাদের ঈমান ও ত্যাগকে "প্রকৃত ঈমান"-এর মানদণ্ড হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৯। সাহাবীদের অনুসরণ করার নির্দেশ-

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ

"যে আমার দিকে ফিরে এসেছে, তার পথ অনুসরণ কর।" [সূরা লুকমান: ১৫]

ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন— 'এই আয়াতে সাহাবীদের পথ অনুসরণের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, কারণ নবী ﷺ-এর পর যারা তাঁর পথে অবিচল ছিল, তারা-ই সত্যিকার অর্থে অনুসরণীয়।'

এখানে যে কয়েকটি আয়াত তুলে ধরা হলো, আশা করি এগুলোই সাহাবীদের মর্যাদা, তাঁদের মাকবুল ও মাগফুর (ক্ষমাপ্রাপ্ত) হওয়া, তাঁদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং চিরস্থায়ী জান্নাত তাঁদের জন্য অবধারিত হওয়া প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

হাদীসে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

হাদীসে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা সম্পর্কে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে; তাঁদের প্রতি ঈমান ও ভালোবাসা রাখা প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানের অংশ এবং তাঁরা ইসলামের অনন্য গৌরব। নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভ, ইসলামের জন্য আত্মত্যাগ এবং তাঁর অনুসৃত পথ অনুসরণ করার মাধ্যমে তাঁরা এই বিশেষ মর্যাদা অর্জন করেছেন। হাদীসে সাহাবীর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের সমালোচনা করা মুনাফিকের লক্ষণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১। বুখারী, মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে রয়েছে, হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْ نَهُمْ _ فَلَا ادري ذَكَرَ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً. ثُمَّ بَعْدَ هُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُوْنَ وَلَا يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَخُوْنُوْنَ وَلَا يُوْ تَمَنُوْنَ وَيُنْذِرُوْنَ وَلَا يُوْفُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ

“আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ, মর্যাদার বিচারে এর পরের স্থানে তাদের যুগ যারা আমার যুগের সঙ্গে মিলিত। এরপর তাদের যুগ যারা তাদের (সাহাবীদের) সঙ্গে মিলিত। এরপর তাদের যুগ যারা তাদের (তাবেঈদের) সঙ্গে মিলিত। বর্ণনাকারী বলেন, এখন আমার মনে নেই যে তিনি যুগ দুইটি উল্লেখ করেছিলেন না তিনটি। এরপর এমন এমন লোক আসবে যারা না চাইলেও সাক্ষ্য দিতে তৈরি হয়ে যাবে। খিয়ানত করবে, আমানত রক্ষা করবে না, ওয়াদা ভঙ্গ করবে, অঙ্গীকার রক্ষা করবে না। তাদের মাঝে (আদর্শিক চিন্তা-চেতনা না থাকার দরুন) স্থূলতা প্রকাশ পাবে।”

এই হাদীসে যদি যুগের উল্লেখ দু'বার হয়ে থাকে, তবে দ্বিতীয় যুগ সাহাবীদের এবং তৃতীয় যুগ তাবেঈদের। তিনবার বললে চতুর্থ যুগ তাবে তাবেঈগণের—হাদীসের মধ্যে তাঁরাও সমিল হয়ে যাবেন।

২। তিরমিযী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اَللهُ اَللهُ فِي أَصْحَابِي، لَا تَتَّخِذُوْ هُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِي. فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُم وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُم، وَمَنْ أَذَاهُمْ فَقَدْ أَذَانِي وَمَنْ أَذَانِى فَقَدْ أَذَى الله وَمَنْ أَذَى الله فَيُوْشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ

“সাবধান! সাবধান আমার সাহাবীদের ব্যাপারে, আমার পরে তাদের সমালোচনার ক্ষেত্র বানিয়ো না। যে ব্যক্তি তাদের মুহাব্বত করল, সে প্রকৃত পক্ষে আমাকে মুহাব্বতের কারণেই তাদের মুহাব্বত করল। যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল, সে মূলত আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল, যে ব্যক্তি তাদের কাউকে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল। যে আমাকে কষ্ট দিল, সে আল্লাহকে কষ্ট দিল। যে ব্যক্তি আল্লাহকে কষ্ট দেবে শিগগিরই আল্লাহ তা'আলা তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন।”

‘যে ব্যক্তি তাদের মুহাব্বত করল, প্রকৃতপক্ষে আমাকে মুহাব্বতের কারণেই সে তাদের মুহাব্বত করল' বাক্যটির দুটো ব্যাখ্যা রয়েছে :

এক- সাহাবীদের প্রতি মুহাব্বত-ভালোবাসা, আমার প্রতি মুহাব্বত-ভালোবাসার আলামত, অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই তাঁদের ভালোবাসে যার অন্তরে আমার প্রতি ভালোবাসা আছে।

দুই- যে ব্যক্তি আমার কোনো সাহাবীকে ভালোবাসে, এর অর্থ সেই ব্যক্তির প্রতি আমি মুহাম্মাদের ভালোবাসা রয়েছে। একই ব্যাখ্যা বিদ্বেষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

যে ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হোক এই হাদীস তাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সতর্ক সঙ্কেত, যারা সাহাবায়ে কেরামকে স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ সমালোচনার লক্ষ্য বানিয়ে থাকেন, তাঁদের ব্যাপারে এমন এমন কথা বলেন বা লিখেন যার কারণে শ্রোতা বা পাঠক তাঁদের ব্যাপারে আস্থা, বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, সাহাবীদের সমালোচনা করা প্রিয় নবী ﷺ-এর নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সমতুল্য।

৩। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِي فَإِنَّ اَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ

“খবরদার আমার সাহাবীদের মন্দ বলো না। কেননা তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে তাহলে সেটা সাহবীদের এক মুদ অথবা আধা মুদের সমানও হবে না।” (মুদ এক কেজির কাছাকাছি একটি পরিমাণ)

এই হাদীস সাহাবীদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক অনন্য মর্যাদার কথা তুলে ধরেছে। অন্যদের পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও তাঁদের এক কেজি বরং আধা কেজি পরিমাণ দানের কাছাকাছি মর্যাদা পাবে না। তাহলে সাহাবীদের আমলকে অন্যদের আমলের সঙ্গে কী করে তুলনা করা সম্ভব?

৪। ইমাম আহমাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন-

مَنْ كَانَ مُتَأَسِّيًا فَلْيَتَأَسَّ بِأَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُمْ اَبَرُّهَذِه الأُمَّةِ قُلُوْبًا وَاَعْمَقُهَا عِلْمًا وَ أَقَلُّهَا تَكَلُّفًا وَ اَقْوَمُهَا هَدْيًا وَأَحْسَنُهَا حَالًا . قَوْمٌ اِخْتَا رَهُمُ اللهُ بِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَإِقَامَةِ دِينِهِ - فَاعْرِفُوْا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوْا أٰثَارَهُمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوْا عَلَى الهُدَى الْمُسْتَقِيمِ-

"কেউ যদি কারোর আদর্শের অনুসরণ করতে চায়, তবে তার উচিৎ প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের অনুসরণ করা। কারণ গোটা উম্মতের মাঝে তাঁরাই অন্তরের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি পবিত্র, জ্ঞান ও ইলমের বিষয়ে গভীরতম। লৌকিকতার বিচারে স্বল্পতম, আদর্শ, চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের দিক লক্ষ্য করলে তাঁরা দৃঢ়তম, অবস্থার দিক দিয়ে তাঁরা ছিলেন শ্রেষ্ঠতম। তাঁরা ছিলেন এমন এক কওম যাঁরা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের জন্য এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য মনোনীত। অতএব, তোমরা তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা জেনে রাখো এবং তাঁদের অনুসরণ করে চলো। কারণ তাঁরাই সরল, সোজা ও সঠিক পথে পরিচালিত।"

বর্ণিত আয়াত ও হাদীসের সারমর্ম

পূর্বে বর্ণিত আয়াত এবং উপরের এই হাদীসগুলোতে শুধুমাত্র সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা, তাঁদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের ঘোষণা দিয়েই শেষ করা হয়নি বরং উম্মতের প্রতি জোরালো হুকুম দেওয়া হয়েছে যেন তাঁদের আদব-সম্মান বজায় রাখে এবং তাঁদের অনুসরণ করে চলে। তাঁদের কাউকেই মন্দ বলার বিরুদ্ধে উচ্চারণ করা হয়েছে কঠোর হুশিয়ারী। তাঁদের প্রতি ভালোবাসাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা হিসাবে। তাঁদের প্রতি বিদ্বেষকে গণ্য করা হয়েছে নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিদ্বেষ হিসাবে।

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার অনন্যতা

রসূলে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের জীবন আমরা যতই অধ্যয়ন করবো, ততই অভিভূত হবো, আবেগে আপ্লুত হবো, অশ্রুসিক্ত হবো আর হতবাক হবো। এ মানুষগুলোর জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছিল বিস্ময়ের বিস্ময়। একসময় যে মানুষগুলো জাহিলিয়াতের অতল তিমিরে নিমজ্জিত ছিল, তাঁরাই নবীজি ﷺ-এর পবিত্র সাহচর্যে পরিণত হয়েছিলেন সকল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষে। নববী তালীমের ছোঁয়ায় তাঁরাই হয়ে গেলেন মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম! তাঁরা পরিণত হলেন এমন পরশপাথরে— যার উজ্জ্বলতার আলোকচ্ছটা ঠিকরে পড়েছে আরবের অলিগলি থেকে তামাম পৃথিবীর দুয়ারে দুয়ারে।

প্রথম জীবনে তাঁদের অধিকাংশের কাজ ছিল উপত্যকায় ভেড়ার পালের নেতৃত্ব দেওয়া-ই, আর তাঁরাই কি না নেতৃত্ব দিয়েছেন অর্ধ পৃথিবীর বুকে। একটি সূর্য যেমন অসংখ্য আয়নায় বিম্বিত হতে পারে, তেমনি লক্ষাধিক সাহাবীর জীবনের দর্পণে সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তির নূরানী দীপ্তি।

■ সকল কিতাবে যাঁরা আলোচিত

সাহাবায়ে কেরাম শুধু উম্মতে মুহাম্মাদির শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম নন; বরং সকল নবীর উম্মতের মধ্যেও তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ। আম্বিয়ায়ে কেরামের পরেই তাঁদের মর্যাদা। সাহাবীদের আগমনের হাজার হাজার বছর পূর্বেও আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য আসমানি কিতাবসমূহে তাঁদের চরিত্র ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন-

... ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ ...

“তাদের এই বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে তাওরাতে। আরও আলোচিত হয়েছে ইনজিলে।” [সূরা ফাতহ : ২৯]

■ যেন আকাশের ধ্রুবতারা

নিকষকালো রাতে দিকভ্রান্ত মুসাফির বা মহাসাগরে ভাসমান দিশেহারা নাবিক যেমন আকাশের তারার আলোয় পথ খুঁজে বেড়ান, ঠিক তেমনি লক্ষ্যহারা নিরুদ্দেশের পথে চলমান মানবতার জন্য সাহাবায়ে কেরাম যেন আকাশের ধ্রুবতারা। তাঁদের জীবনকে অনুসরণ করে মানুষ খুঁজে পাবে জান্নাতের পথ। আলোকিত মুক্তির মনজিল।

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা, পরহেজগারিতা ও দ্বীনের জন্য তাঁদের ত্যাগ-কুরবানির স্তর এতই উচ্চ যে, আল্লাহ তা'আলা সাহাবীদের উপর সন্তুষ্ট হওয়ার সংবাদ কুরআনে ওহি করেছেন। তিঁনি বলেন-

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ...

“মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী এবং যারা ইহসানের সাথে এই অগ্রগামী সাহাবিদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।” [সূরা তাওবা: ১০০]

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির নিয়ামতে সাহাবীগণ ধন্য। তাঁরা নবীদের মতো মাসুম বে-গুনাহ নন। তাঁদের জীবনে গুনাহ হয়েছে, কিন্তু তা তাঁদেরকে এতই অনুতপ্ত করেছে যে, তাওবার ক্রন্দনে তাঁদের পাপ শুধু মোচনই হয়নি; বরং তা তাঁদের জীবনকে করেছে আরও নির্মল, আরও বর্ণিল।

সাহাবী মায়েয ইবনে মালিক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে নিজের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে বললেন- ‘ইয়া রসূলাল্লাহ! ব্যভিচার থেকে আমাকে পবিত্র করুন, আমার উপর যিনার শাস্তি কার্যকর করুন।’ তিনি নিজের যিনার ব্যাপারে বারবার সাক্ষ্য দেওয়ার পর নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপর যিনার শাস্তি কার্যকরের সিদ্ধান্ত দেন। তাঁর সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই তাঁর উপর মৃত্যুর হদ কার্যকর করা হয়। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়েয ইবনে মালিক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলেন-

لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ .

“মায়েয ইবনে মালিক এমনভাবে তাওবা করেছে, যদি সেই তাওবা কোনো অন্যায়কারী জাতির মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়, তবে তা তাদের জন্যও যথেষ্ট হবে।” [মুসলিম: ৪২৮২]

সুবহানাল্লাহ! সাহাবীগণ কখনও কোনো ভুল করে ফেললে গফুরুর রহিম আল্লাহ তা'আলার দরবারে কতটা অনুতপ্ত মনে ফিরে আসতেন, এটি তারই একটি অনন্য উদাহরণ।

দ্বীনে মুহাম্মাদির পয়গামকে সূর্যের উদয়-অস্তের বিস্তৃত সীমানায় যথার্থভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সাহাবায়ে কেরাম ত্যাগের যে নজরানা পেশ করেছেন, তেমন কোনো দৃষ্টান্ত এ পৃথিবীর বুকে আর দ্বিতীয়টি নেই। সাগরের ভীষণ উত্তালতা, পাহাড়ের কঠিন দুর্গমতা, সাহারার অসহ্য উষ্ণতা, অরণ্যের ভয়াবহ গহিনতা কোনো কিছুই তাদের চলার পথ রুদ্ধ করতে পারেনি। সব বাধা মাড়িয়ে তাঁরা পৌঁছে গেছেন প্রতিটি জনপদে, প্রতিটি প্রান্তরে। তাঁদের সৃষ্টিশীল পদচারণায় রচিত হয়েছে সভ্যতার এক নতুন বাগান। সে বাগানের সুঘ্রাণ নিতে ব্যাকুলপ্রাণ পাখিদের ঝাঁক, বনের হরিণ, আর নববি আদর্শের বেশুমার মানব-ভোমর।

■ উম্মতের জন্য যারা আমানত

আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে যতটুকুন নির্ভেজাল ইসলামি অনুশাসন আজও আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা সাহাবায়ে কেরামেরই অবদান। উম্মতের সমস্ত নেক আমলের মধ্যে তাঁদের অংশ নির্ধারিত রয়েছে। সাহাবীদের কাছ থেকেই দ্বীন ইসলামের খবর পেয়েছে উম্মাহ। আর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখনিসৃত হাদীস তাঁদের থেকেই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং দুশমনের কণ্ঠ ও কলম যদি তাঁদেরকে বিতর্কিত ও সন্দেহজনক করে তুলতে চায়, তবে ইসলামের দুশমনদের প্রচারিত ও বর্ণিত সবকিছুকেই সন্দেহের চোখে দেখতে হবে। কারণ, তা না হলে এসব অপপ্রচারে নড়ে উঠবে ইসলামের ভিত্তি। আর দ্বীনি প্রাসাদের প্রতিটি দেয়ালে দেখা দেবে ফাটল। এজন্যই আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

أَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي .

"আমার সাহাবীরা উম্মতের জন্য আমানত বা প্রতিরক্ষাস্বরূপ।" [মুসলিম: ৬২৩৬]
রসূলে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিকট রেখে গেছেন দ্বীনের আমানত। আর সাহাবীদের রেখে গেছেন গোটা উম্মাহর নিকট আমানত।

■ রাসূলের যারা অতি প্রিয়

সাহাবায়ে কেরামকে যথাযথ সম্মান করা ঈমানের বহিঃপ্রকাশ। তাঁদের বিষয়ে অসুন্দর ও অশালীন কথা বলা থেকে স্বীয় জিহ্বা ও কলম নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা যে হৃদয়ে রয়েছে, সে হৃদয়ে সাহাবীদের বিষয়ে বিদ্বেষ লালন করা অসম্ভব। তাঁদের উপর আক্রমণের তীর সরাসরি নবীয়ে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজায় বিদ্ধ হয়। আবু সাঈদ খুদরি রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে লক্ষ্য করে বলেছেন-

لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِي فَإِنَّ اَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ

"তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ করো না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর, তবে আমার সাহাবীদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ পরিমাণ দানের সওয়াবও তোমাদের অর্জিত হবে না।" [বুখারি: ৩৪০৮]

ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি একদিন দেখলেন, এক ব্যক্তি জনৈক পরহেজগার লোকের আমলকে সাহাবীদের আমলের সাথে তুলনা করছেন। তখন ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন-

مُقَامُ أَحَدِهِمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً وَاحِدَةً، خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِنَا جَمِيعَ عُمْرِهِ، وَإِنْ طَالَ.

"রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একজন সাহাবীর এক মুহূর্তের অবস্থান আমাদের আজীবনের আমলের চেয়েও উত্তম-আমাদের জীবন যতই দীর্ঘ হোক না কেন।"
মানকিবু আবু হানিফা

ইমরান ইবনে হুসাইন রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

خَيْرٌ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ.

"আমার উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ। এরপর উত্তম হলো তার পরবর্তী যুগ। এরপর তার পরবর্তী যুগ।" [বুখারি: ৩৩৮৮]

■ মানবীয় ত্রুটিবিচ্যুতি স্বাভাবিক

জীবনের সকল ক্ষেত্রে সঠিক কথাটি যথার্থভাবে পেশ করাই আমাদের উচিত। সেক্ষেত্রে কাউকে এড়িয়ে বা কাউকে বাড়িয়ে কিছু বলা ও লেখা জুলুম। বিদ্বেষ যেমন সীমালঙ্ঘন, তেমনি অতিরিক্ত আবেগের বশীভূত হয়ে সত্যকে ঢেকে রাখাও অন্যায্য। এই বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি কোনোটাই ইনসাফ নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে এবং জুলুম থেকে দূরে থাকতে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সর্বদা যা সত্য তা বলার ও লিখার তাওফিক দিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।" [সূরা মায়িদা: ৮৭]

সাহাবীরাও মানুষ; যদিও তাঁরা উম্মাহর মধ্য থেকে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সান্নিধ্য ও শিষ্যত্বের জন্য বিশেষভাবে নির্বাচিত শ্রেণি। তবে মানুষ হিসেবে তাঁদের দ্বারা ভুল-ত্রুটি ও গুনাহ প্রকাশিত হওয়া সম্ভব; কিন্তু তাঁরা এর ওপর অবিচল থাকেন না, বরং আন্তরিকভাবে তাওবা করেন এবং রবের বিশেষ ক্ষমাপ্রাপ্ত বান্দা হিসেবে আরও সুমহান মর্যাদা লাভ করেন।

সাহাবীদের জীবনে মানবীয় ত্রুটিবিচ্যুতির উপস্থিতি স্বাভাবিক। হয়তো-বা তাঁদের মধ্যে কারও সামাজিক জীবনের বিতর্কিত আচরণ ও সিদ্ধান্ত নবিয়ে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানদণ্ডে পর্যালোচিত না হলে পরবর্তী প্রজন্ম ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতো। যেমন-উষ্ট্রের যুদ্ধে আমিরুল মুমিনিন আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে আম্মাজান আ'য়িশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা-এর নেতৃত্বদান। এ থেকে নারী নেতৃত্ব বৈধ সাব্যস্ত করার

কোনো সুযোগ নেই। আবার আমিরে মুয়াবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর স্বীয় পুত্র ইয়াজিদকে মুসলিমদের অবাধ রায় ছাড়া পরবর্তী শাসক হিসেবে মনোনয়নদানকে কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য বলা যায় না।

আম্মাজান আ'য়িশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা তাঁর উপর্যুক্ত ভুলের জন্য পরবর্তী জীবনভর কেঁদেছেন। তিনি এজন্য এতই কাঁদতেন যে, চোখের পানিতে তাঁর ওড়না ভিজে যেত। আবার মুয়াবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় ভুলের জন্য এতই অনুতপ্ত ছিলেন যে, জীবন সায়াহ্নে তিনি ইয়াজিদের মনোনয়নের বিষয় নিয়ে বারবার কাঁদছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা চাচ্ছিলেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় সাহাবীদের কাউকে অমর্যাদা করা হয়নি। যে ভুলের জন্য তাঁরা নিজেরাই অনুতপ্ত হয়ে ক্রন্দন করেছেন, তাওবা করেছেন, সে ভুলের কালিমা তাঁদের জীবনে আর অবশিষ্ট নেই।

■ বিশেষভাবে যারা নির্বাচিত

ইসলামের মধ্যে উম্মতের দ্বীনি মর্যাদার যতগুলো অবস্থান রয়েছে, যেমন-মুত্তাকি, মুফাসসির, মুজতাহিদ, ওলি ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত কোনো বুজুর্গকে সাধারণ সাহাবিদের সাথেও তুলনায় আনা সম্ভব নয়। এমন তুলনা অসম্ভব ও অকল্পনীয়! এমনকি এদের সমগ্র জীবনের তাকওয়ার পুঁজি সাহাবীদের রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এক মুহূর্ত অবস্থানের সাথেও তুলনীয় নয়।

অন্যদের বুজুর্গি সাহাবায়ে কেরামের তুলনায় যেন অতলান্ত সমুদ্রের অথৈ জলারাশির কাছে সুচাগ্রে জলকণা। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হওয়ার জন্য এবং তাঁর দ্বীনের সাহায্যের প্রয়োজনে এ আজিমুশশান জামায়াতকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা নিজ থেকে নির্বাচন করেছেন। সাহাবীদের মর্যাদা ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদির দায়িত্ব। কেননা, সাহাবীগণ গোটা উম্মতের অহংকার ও মর্যাদার প্রতীক। তাঁদের মহান মর্যাদাকে মসিময় করার যেকোনো চক্রান্তকে যেকোনো মূল্যে প্রতিহত করতে হবে। এটি ঈমানি দায়িত্ব। উম্মতের মাঝে বিভ্রান্ত শিয়াদের একটি উপদল সাহাবায়ে কিরামদের কারও কারও ব্যাপারে মিথ্যা আরোপ করেছে। এমনকি সাইয়িদুনা আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু, উমার ইবনে খাত্তাব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও

আম্মাজান আ'য়িশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা-এর ব্যাপারে তাদের মন্তব্য খুবই আপত্তিকর। এ সকল মহান সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কালাম ও সহিহ হাদীসে প্রশংসা এসেছে যে, স্বয়ং মহান আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট। কেউ যদি তাঁদের অসম্মানিত করে, আর সে সময়ে উপস্থিতদের যদি আল্লাহ তা'আলা ও রসূল সল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান জীবিত থাকে, তবে অবশ্যই সে ব্যক্তি এ সকল পথভ্রষ্টদের বাধা প্রদান করবে। এ বিষয়ে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সতর্কবাণী প্রণিধানযোগ্য।

আবদুল্লাহ ইবনে উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُوْلُوْا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ .

"যারা আমার সাহাবিদের গালমন্দ করে, তাদের তোমরা বলবে-তোমাদের দুষ্কর্মের ওপর আল্লাহর লানত।" [তিরমিযি: ৩৮৬৬]

সাহাবীদের মর্যাদাগত বিভিন্ন স্তর

মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়তি বরকতময় স্পর্শ লাভে যাদের জীবন ধন্য হয়েছে, তাঁরা সকলেই সাহাবী। সাহাবী অভিধার ক্ষেত্রে তাঁদের মাকাম বা অবস্থান এক ও অভিন্ন। এটি এমন এক দরজা-যা দিয়ে পরবর্তী সময়ের আর কারও প্রবেশ করা সম্ভব নয়। এ দরজা চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেছে। কোনো আমল দিয়ে এ মর্যাদার আসনে সমাসীন হওয়া যাবে না। তবে এ মনজিলে যারা পৌঁছেছেন, তাঁরা সকলে সাহাবী হিসেবে এক দরজার হলেও তাঁদের নিজেদের মধ্যে মর্যাদাগত তারতম্য রয়েছে। আমরা এখন মর্যাদার ক্রমানুসারের দিকে চোখ বুলাবো।

- **খুলাফায়ে রাশিদুন**

সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম রদ্বিয়াল্লহু আনহু-এর জামায়াতের মধ্যে মর্যাদাগত দিক থেকে খলিফায়ে রাশিদগণ অনন্যতার অধিকারী। তাঁরা হলেন আবু বকর ইবনে আবি কুহাফা, উমার ইবনুল খাত্তাব, উসমান ইবনে আফফান ও আলী ইবনে আবি তালিব রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম। তাঁরা সাহাবিদের নেতা এবং উম্মাহর
পথপ্রদর্শক। তাঁরা রাসূলে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে উম্মতে মুহাম্মাদির নেতৃত্বের হাল ধরেছেন। তাঁরা ইসলামি জীবনব্যবস্থার অনন্যতা পৃথিবীবাসীর সামনে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। রাষ্ট্রব্যবস্থা কত সৌন্দর্যমণ্ডিত ও ইনসাফপূর্ণ হতে পারে, তার অনুপম নজির তাঁরাই স্থাপন করেছেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর রেখে যাওয়া আদর্শের আমানতকে তাঁরা বুলন্দ করেছেন আরব ও আজমে। আদ্বল ও ইনসাফের ছায়া তাঁরা ছড়িয়ে দিয়েছেন অর্ধ পৃথিবীব্যাপী। নবি-রাসূলদের পরে ইনসানিয়াতের সর্বোচ্চ

সৌকর্য বিকশিত হয়েছে খুলাফায়ে রাশিদুনের চরিত্রে ও জীবনে। এজন্যই রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সুন্নাতের পাশাপাশি খুলাফায়ে রাশিদুনের রীতিকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِنِ.

“তোমাদের করণীয় হলো-আমার সুন্নাত এবং সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদুনের রীতিকে আঁকড়ে ধরা। তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে এমনকি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে।” [আবু দাউদ: ৪৬০৭]

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইন্তেকালের পরবর্তী ৩০ বছর সময়কালকে 'খিলাফত আলা মিনহাযিন নুবুওয়াত' তথা নবুওয়ত অনুগামী খিলাফত থাকবে বলে ইশারা করে গিয়েছেন। সাঈদ ইবনে জুমহান রহমাতুল্লাহি আলাইহি সাফিনা রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ .

“আমার উম্মতের খিলাফতের শাসনকাল হবে ত্রিশ বছর। তারপর হবে বাদশাহি।” [তিরমিযি: ২২২৯]

বর্ণনাকারী সাঈদ ইবনে জুমহান রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হাদীসটি বলার পর সাফিনা রহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাকে বললেন-

أَمْسِكْ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ وَخِلَافَةَ عُمَرَ وَخِلَافَةَ عُثْمَانَ ، ثُمَّ قَالَ لِي أَمْسِكْ خِلَافَةَ عَلِي ، قَالَ فَوَجَدْنَاهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً .

“আবু বকর (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফতকাল গণনা করো। এরপর বললেন, উমার ও উসমান (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর খিলাফতকাল গণনা করো। এরপর বললেন, আলী (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফতকাল গণনা করো। আমি গুনে দেখলাম যে, এ পর্যন্ত ত্রিশ বছর হয়ে যায়।”

খুলাফায়ে রাশিদুনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنْ تُؤَمِرُوا أَبَا بَكْرٍ ، تَجِدُوهُ أَمِينًا، زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا، رَاغِبًا فِي الْآخِرَةِ، وَإِنْ تُؤَمِرُوْا عُمَرَ تَجِدُوهُ قَوِيًّا أَمِينًا، لَا يَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ ، وَإِنْ تُؤَمِرُوا عَلِيًّا وَلَا أَرَاكُمْ فَاعِلِيْنَ تَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا. يَأْخُذُ بِكُمُ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيم.

“যদি তোমরা আবু বকরকে শাসক নিযুক্ত করো, তবে তাঁকে পাবে আমানতদার; আর সে দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত এবং আখিরাতের প্রতি আসক্ত। আর যদি উমারকে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করো, তবে তাঁকে বিশ্বস্ত ও মজবুত হিসেবে পাবে, আল্লাহর সিদ্ধান্ত

বাস্তবায়নে সে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করবে না। আর যদি তোমরা আলীকে নেতৃত্বের ভার অর্পণ করো, অবশ্য তোমরা তা করবে বলে আমার মনে হয় না। তবে তাঁকে পাবে সঠিক পথে পরিচালক ও পরিচালিত। সে তোমাদের সরল ও সঠিক পথে পরিচালনা করবে।" [মুসনাদে আহমাদ: ৮৫৯]

- **আশারায়ে মুবাশশারা**

সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের উপর মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির শুভ সংবাদ রয়েছে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে দশজন সাহাবি এমন রয়েছেন-যারা জান্নাতি হিসেবে দুনিয়াতেই বিশেষভাবে প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত হয়েছেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র কণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছেন সে সৌভাগ্যবানদের নামগুলো।

'আশারা' আরবি শব্দ; এর অর্থ হলো দশ। আর 'মুবাশশারা' অর্থ সুসংবাদপ্রাপ্ত। অতএব, 'আশারায়ে মুবাশশারা' অর্থ সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ ব্যক্তি।

পরিভাষায় আশারায়ে মুবাশশারা বলতে সে দশজন সাহাবীকে বোঝায়, যারা জীবদ্দশায় প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র কণ্ঠে প্রত্যক্ষভাবে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন। তবে পরোক্ষভাবে আরও অনেক সাহাবি জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন। এ দশজন এক মজলিসে জান্নাতের ঘোষণা পেয়েছেন বিধায় তাঁদের ব্যাপারটি বেশি প্রসিদ্ধ। কে এই দশজন? কী এমন মহান নিষ্ঠা তাঁরা দেখিয়েছেন, যার বিনিময়ে বিশ্বাসী মনের কাঙ্খিত মনজিল নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতের ঘোষণা পেয়ে গেছেন এ পৃথিবীতে অবস্থানকালেই! পুনরুত্থানের আগেই তাঁদের পক্ষে রায় হয়ে গেল শারাবান তাহুরার। অনুমতি মিলে গেল সালসাবিল ঝরনার রূপসুষমা উপভোগের। এ পরম সুসংবাদ তাঁরা পেয়ে গেলেন দুনিয়া নামক এ সরাইখানায় বসেই! সুবহানাল্লাহ! কী বিশেষ সে আমল! আসুন ফিরে যাই মসজিদে নববির সেই মজলিসে।

হিজরি দশম সন। এ সময় মদিনায় এক ভয়াবহ খরা দেখা দেয়। মদিনায় কোনো ফসল সেবার উৎপন্ন হলো না। গাছের সবুজ পাতাগুলো অতি খরায় ছাইরঙ ধারণ করেছে। এ খাদ্যাভাবের সময়ে বহু লোক অনাহারে অভুক্ত অবস্থায় ছিল। কোনো দিক থেকে সহযোগিতা ও খাদ্যসামগ্রী মদিনায় আসার কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছিল না। এমনি একদিন নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববিতে সাহাবীদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিচ্ছেন। এমন সময় হঠাৎ সংবাদ এলো যে, শামদেশ থেকে প্রচুর খাদ্যসামগ্রী নিয়ে একদল ব্যবসায়ী মদিনায় আগমন করছে। শাম হলো বর্তমান সিরিয়া। খাদ্য ঘাটতির সে সময়টাতে খাদ্যসামগ্রীর খবর শুনে তড়িঘড়ি করে সকলে সেদিকে ছুটল। দলে দলে

সকলেই সে ব্যবসায়ী কাফেলার নিকট ভিড় জমাল। কেবল দশজন সাহাবী খুতবারত অবস্থায় থাকা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে বসে রইলেন। ক্ষুধার আহার জোগাড়ে ব্যতিব্যস্ত হলেন না; বরং মনোযোগ সহকারে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খুতবা শ্রবণে নিমগ্ন রইলেন তাঁরা। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের একাগ্রতা দেখে খুব খুশি হলেন। এরপর একে একে তাঁদের নাম উল্লেখ করে তাঁদেরকে জান্নাতি বলে ঘোষণা করলেন। সাঈদ ইবনে যায়েদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন-

قَالَ عَشَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ فَعَدَّ هَؤُلَاءِ التِّسْعَةَ وَسَكَتَ عَنِ الْعَاشِرِ فَقَالَ الْقَوْمُ نَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا أَبَا الأَعْوَرِ مَنِ الْعَاشِرُ قَالَ نَشَدْتُمُونِي بِاللَّهِ أَبُو الأَعْوَرِ فِي الْجَنَّةِ .

"রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-‘দশজন ব্যক্তি জান্নাতি। আবু বকর জান্নাতি, উমার জান্নাতি এবং আলী, উসমান, যুবাইর, তালহা, আবদুর রহমান, আবু উবাইদা ও সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস জান্নাতি।’ রাবি বলেন, সাঈদ ইবনে যায়েদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু উক্ত নয়জনকে গুনে গুনে নাম বললেন এবং দশমজন প্রসঙ্গে নীরব থাকেন। সে সময় লোকেরা বলল, ‘হে আবুল আওয়ার! আপনাকে আমরা আল্লাহর নামে কসম দিয়ে বলছি, দশম লোক কে?’ সাঈদ ইবনে যায়েদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তোমরা যেহেতু আমাকে আল্লাহর নামে কসম দিয়ে প্রশ্ন করেছো, সেজন্য বলতে হচ্ছে! তাঁদের দশমজন হলেন আবুল আওয়ার।” (আবুল আওয়ার হলো সাঈদ ইবনে যায়েদের উপনাম। অতএব, দশমজন হলেন সাঈদ ইবনে যায়েদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) [তিরমিযি: ৩৭৪৮]

অনেকের মধ্যে এই ভুল ধারণা রয়েছে যে, সকল সাহাবীর মধ্য হতে কেবল দশজন সাহাবীই জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছেন, যাদেরকে আশারায়ে মুবাশশারা বলা হয়। তাদের এ ধারণা যথার্থ নয়। উপর্যুক্ত দশজন ছাড়াও আরও অনেক সাহাবী নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কণ্ঠে জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছেন।

এ তো জানা কথা যে, নবী কারিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ভাষ্যমতে, নবীদৌহিত্র হাসান-হুসাইন রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম জান্নাতের যুবকদের নেতা হবেন এবং তাঁদের মা নবীকন্যা ফাতিমা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা জান্নাতের নারীদের নেত্রী হবেন। ইসলামের জন্য লড়াকুপ্রাণ, হাবশি গোলাম, ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন বিলাল রদ্বিয়াল্লাহু আনহু কেও নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহানিয়ামতপূর্ণ জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। একদা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলেন-

فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ.

“আজ রাতে আমি জান্নাতে তোমার জুতার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি।” [মুসলিম: ২৪৫৮]
নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা জাফর ইবনে আবু তালিবের জান্নাতের পাখির মতো উড়ে বেড়ানোর সুসংবাদ নবীজি ﷺ এভাবে দিচ্ছেন-

رَأَيْتُ جَعْفَرًا يَطِيرُ فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ .

“আমি স্বপ্নে জাফরকে জান্নাতের মধ্যে ফেরেশতাদের সাথে উড়ে বেড়াতে দেখেছি।” [তিরমিযি: ৩৭৬৩]
আবার খাদিজা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা যখন হেরা পর্বতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাবার বহন করে নিয়ে যেতেন, তখন একদিন জিবরিল আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন-

يَا رَسُولَ اللَّهِا هُذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَّاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَأَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِي، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لَا صَخَبَ فِيْهِ، وَلَا نَصَبَ.

"হে আল্লাহর রাসূল, ওই যে খাদিজা একটি পাত্রে তরকারি অথবা খাবার বা পানি নিয়ে আপনার কাছে আসছেন। যখন তিনি আপনার কাছে আসবেন, আপনি তাঁকে তাঁর রবের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম বলবেন। আর তাঁকে জান্নাতে একটি মুক্তাখচিত প্রাসাদের সুসংবাদ দেবেন, যেখানে কোনো শোরগোল নেই, আর নেই কোনো কষ্ট ও ক্লান্তি।" [বুখারি: ৩৮২০]

মোদ্দাকথা, পরোক্ষভাবে আরও অনেক সাহাবী জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন। তবে এ দশজন প্রথম সারির সাহাবী এক মজলিসে জান্নাতের ঘোষণা পেয়েছেন বিধায় তাঁদের ব্যাপারটি অধিক প্রসিদ্ধ এবং বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ।

■ আহলে বাইত ও উম্মাহাতুল মু'মিনিন

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের জন্য সমস্ত উম্মতের হৃদয়ে রয়েছে বিশেষ মর্যাদা ও ভালোবাসা। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিতা স্ত্রীগণ গোটা উম্মতের জননী হিসেবে বরিত। সকলের নিকট সম্মানিত। আর নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাগণও বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন।
‘আহলে বাইত’ শব্দযুগলের অর্থ ঘরের বাসিন্দা। ইসলামি পরিভাষায় মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গকে আহলে বাইত বলা হয়। আহলে বাইত অত্যন্ত

মর্যাদাপূর্ণ একটি পরিচয়। আল্লাহ তা'আলা আহলে বাইতকে বিশেষ সম্মানের আসনে সমাসীন করেছেন। আহলে বাইতের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

... إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“হে নবি পরিবার, আল্লাহ চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।” [সূরা আহযাব: ৩৩]

আল্লাহ তা'আলা যাদের পবিত্রতার দায়িত্ব নিয়েছেন, তাঁদের আর হারানোর কিছু নেই। আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁদের সম্মান কতটুকু, তা উপর্যুক্ত আয়াত থেকে খুব সহজেই অনুমিত হয়। তাঁদের মর্যাদাকে বিশেষায়িত করতে আহলে বাইতের জন্য সদাকা ও মানত গ্রহণ হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

আহলে বাইতের প্রধানতম সদস্য হলেন-আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম। তাঁরা বিশেষ মর্যাদাবান। এক সকালে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ চারজনকে এক চাদরের ভেতর পরম আদরে জড়িয়ে আহলে বাইত বলে সম্বোধন করেছেন। তারপর তাঁদের সম্মানে নাযিলকৃত আয়াতটি তিলাওয়াত করেছেন। উম্মুল মু'মিনিন আ'য়িশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত–

خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا .

“নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সকালবেলা (ঘরের সন্নিকটে) বের হলেন। তাঁর গায়ে ছিল একটি কালো পশমি চাদর। তখন হাসান ইবনে আলী তাঁর কাছে এলেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে চাঁদরের ভেতর ঢুকিয়ে নিলেন। এরপর হুসাইন এলেন। রাসূল ﷺ তাঁকেও হাসানের সঙ্গে চাদরে ঢুকিয়ে নিলেন। এরপর ফাতিমা এলেন এবং রাসূল ﷺ তাঁকেও চাদরের ভেতর জড়িয়ে নিলেন। অতঃপর আলী এলেন। রাসূল ﷺ তাঁকেও চাদরের ভেতরে ঢুকিয়ে নিলেন। (চারজনকেই একই সাথে চাদরাবৃত করা অবস্থায়) রাসূল ﷺ (সূরা
আহযাবের ৩৩তম আয়াতটি) তিলাওয়াত করলেন-হে আহলে বাইত, আল্লাহ তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে চান। আর চান তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।” [মুসলিম: ৬০৪৩]

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইন রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম-কে অত্যধিক ভালোবাসতেন। তাঁদের সাথে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেলাধুলা করতেন। হাসান ও হুসাইন রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম দুজন তাঁদের নানা মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর পিঠকে ঘোড়া বানিয়ে তাতে চড়তেন। এমনকি সিজদাতেও তাঁরা নানার পিঠে চড়তেন। যতক্ষণ তাঁরা নিজ থেকে না নেমেছেন, ততক্ষণ নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মাথা তুলতেন না! পান থেকে চুন খসলেই আমরা যারা শিশুদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করি, তাদের জন্য এতে রয়েছে উত্তম সবক।

হাসান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্য নানা মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ দু'আ করেছেন। হাসান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোনাজাত করেন–

اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَأَحْبِبْ مَن يُحِبُّهُ

“হে আল্লাহ, আমি একে ভালোবসি! আপনিও তাঁকে ভালোবাসুন। যে তাঁকে ভালোবাসে, আপনি তাঁকেও ভালোবাসুন।” [মুসলিম: ৬০৩৮]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন মাজিদে তাঁদেরকে ‘উম্মতের মা’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফের আদর্শ ও সমাজের বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন অবস্থায় তাঁদের মানিয়ে নেওয়ার যে দৃষ্টান্ত নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিয়েছেন, তা আর কে দেখাতে পারে! তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে কেউ ছিলেন বেশি বয়সের, কেউ একেবারে কম বয়সের; কারও বেশি সন্তান, কেউ নিঃস্তান; কেউ বিধবা, কেউ কুমারী; কারও আগের সন্তান ছিল, কারও ছিল না; কেউ সম্পদশালী, কেউ গরিব; কেউ উচ্চ বংশের, কেউবা আবার সাধারণ। কেউ আজাদ, কেউ আবার মামলুক; কেউ উচ্চশিক্ষিতা আবার কেউ স্বল্পশিক্ষিতা। কেউ সুন্দরী, আবার কেউ ছিলেন কম সুন্দরী; কেউ শান্ত মেজাজের আবার কারও মেজাজ কঠোর! ভিন্ন বংশের, ভিন্ন রুচির, ভিন্ন অবস্থার আর নানান বয়সের স্ত্রীদের এক সম্মিলন ঘটেছিল নবীপরিবারে। এই সংযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে দিয়েছেন এক সুশৃঙ্খল পারিবারিক শিক্ষা।

কীভাবে সকল শ্রেণির নারীদের সাথে সংসারজীবন পার করেও সুন্দর একটি পরিবার গঠন করা যায়, তার বাস্তব আদর্শ আমরা খুঁজে পাই মহানবির জীবন থেকে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনকে ধারণ করার জন্য প্রয়োজন ছিল লক্ষাধিক সাহাবীর। অনুরূপভাবে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের একান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের শিক্ষা গ্রহণের জন্যও বহু নারীর প্রয়োজন ছিল। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের বরকতে যারা হয়েছেন ‘উম্মুল মুমিনিন’ তথা বিশ্বাসীদের মা। পেয়েছেন দুনিয়া ও পরকালীন জীবনে নবীপরিবারের

স্থায়ী সদস্যের মর্যাদা।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরও সাহাবীগণ উম্মুল মু'মিনিনদের খোঁজখবরে ছিলেন সজাগ। আবদুর রহমান ইবনে আওফ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু উম্মুল মু'মিনিনদের জন্য সে সময় চার লাখ চল্লিশ হাজার দিরহামের সম্পত্তি ওয়াকফ করেছিলেন।

■ প্রথম যুগের মুহাজির ও আনসারগণ

মক্কায় আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথি হওয়ার কারণে, ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে সাহাবীদের জীবনে নেমে এসেছিল অকথ্য নির্যাতন ও জুলুমের জাঁতাকল! নবুওয়তের ৫ম বছরের শেষের দিকে যখন কুরাইশদের অত্যাচার আর নিষ্ঠুরতা চরমে পৌঁছে, তখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের নির্দেশ দেন। নবীয়ে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা পাওয়ার পর ১১ জন পুরুষ, ৪ জন মহিলাসহ মোট ১৫ জন মুহাজির মরুবালি পাড়ি দিয়ে রওনা হন সুদূর আবিসিনিয়ার উদ্দেশে। আবিসিনিয়া বর্তমানে ইথিওপিয়া নামে পরিচিত। এ জামায়াতের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন উসমান ইবনে আফফান, জাফর ইবনে আবু তালিব, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, মুসআব ইবনে উমাইর, উসমান ইবনে মাযউন রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ।

আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশি মুসলিমদের দারুণভাবে সাহায্য করেন। কুরাইশরা আবিসিনিয়ায় মুসলিমদের আশ্রয়স্থল গড়ে উঠুক, তা চায়নি। তাই তারা নাজ্জাশির কাছে দূত পাঠিয়ে তাঁর দেশ থেক মুহাজির মুসলিমদের তাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান করে। কিন্তু নাজ্জাশি তা অনুমোদন করেননি। সেদিন তেজস্বী কণ্ঠে নাজ্জাশি নবীর সাহাবীদের নিরাপত্তার ঘোষণা দেন! তিনি নিজেও ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় গায়েবানা জানাযা আদায় করেন।

নবুওয়তের এগারো ও বারোতম বছর হজ মৌসুমে মদিনার কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় দাওয়াতি কাজ ও নওমুসলিমদের তারবিয়াতের জন্য মুস'আব ইবনে উমাইর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে প্রেরণ করেন। পরবর্তী বছর হজের সময় মুসআব ইবনে উমাইর ৭৫ জন মুসলিমের বিরাট বহরসহ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আকাবা নামক স্থানে সমবেত হন। মদিনাবাসী মুসলিমরা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মক্কায় নিপীড়িত মুসলিমদের মদিনায় আমন্ত্রণ জানান।

মদিনাবাসীর আন্তরিক আমন্ত্রণ ও আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে ও নির্দেশে তাঁর আগে ও পরে প্রায় সকল মুসলিম তাঁদের ভিটেমাটি, ধনসম্পদ ও সর্বস্ব ছেড়ে মদিনায় হিজরত করেন। হিজরতকারী এ সকল সাহাবি হলেন 'মুহাজির'।
মদিনাবাসীরা মুহাজির সাহাবীদের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। মদিনার মুসলিমদের আন্তরিক সাহায্যের কারণে তাঁদের বলা হতো 'আনসার'। আনসার শব্দের অর্থ সাহায্যকারী।
আল্লাহ তা'আলা ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুহাজির ও আনসারদের প্রশংসা করেছেন কুরআনে হাকিমে–

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা তাঁদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট। তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আর আল্লাহ তায়ালা তাঁদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন এমন জান্নাত, যাতে প্রবাহিত হয় ঝরনাধারা। সেখানে তাঁরা চিরস্থায়ী হবে। এটা মহাসাফল্য।" [সূরা তাওবা: ১০০]
ইসলামকে গ্রহণের কারণে নবীর সাহাবীদের জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে হিজরত করে চলে যেতে হলো মদিনায়। অপরদিকে মদিনার আনসারি সাহাবীরাও সব আধিপত্যকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে মুহাজিরদের ভাই হিসেবে বরণ করে নিল। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এ ত্যাগতিতিক্ষার কারণে মুহাজির ও আনসারদের ভালোবাসতেন। তাঁদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে কায়মনবাক্যে দু'আ করতেন।
খন্দক যুদ্ধের সময় সাহাবায়ে কেরাম মাটি কাটছিলেন। তাঁদের সাথে মাটি কাটার কাজ করছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাহল ইবনে সা'দ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, সেদিন যখন আমরা পরিখা খননের জন্য মাটি কাটছিলাম এবং কাঁধে করে মাটি বহন করছিলাম, তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন–

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ

"হে আল্লাহ, প্রকৃত জীবন একমাত্র আখিরাতের জীবন। মুহাজির ও আনসারদের আপনি ক্ষমা করে দিন।" [বুখারি: ৩৫২৫]
আনাস ইবনে মালিক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

آيَةُ الإِيْمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ

"আনসারদের প্রতি ভালোবাসা ঈমানেরই নিদর্শন। আর তাঁদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা মুনাফিকির পরিচায়ক।" [বুখারি : ৩৫১৩]

■ **আহলে আকাবা**

‘আকাবা’ মক্কা থেকে দুই মাইল দূরে হেরা পাহাড় ও মিনার মধ্যবর্তী একটি উপত্যকা। সময়টি ছিল নবুওয়তের একাদশতম বছর। অত্যন্ত গোপনে সে উপত্যকায় উপস্থিত হন মদিনার বারোজনের সত্যান্বেষী একটি ক্ষুদ্র দল। তাঁরা ছিলেন মদিনার নামজাদা গোত্র বনু খাযরাজ ও বনু আউসের লোক। তাঁরা আকাবা উপত্যকায় রাসূলের নিকট ইসলামের শপথ বাক্য পাঠ করেন। এ শপথে অংশগ্রহণকারী সাহাবা আসাদ ইবনে যুরারা এবং মদিনায় প্রেরিত আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি মুসআব ইবনে উমাইর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমের আন্তরিক চেষ্টায় ইসলামের পতাকাতলে শামিল হতে থাকে মদিনার মানুষ। মদিনা এতদিন নিমজ্জিত ছিল অজ্ঞতার অতল অমানিশায়! ইসলামের রওশনে মদিনা ক্রমেই আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠল। ইসলাম গ্রহণের পর মদিনাবাসীরা ব্যাকুল হলো নবিকে নেতা হিসেবে পেতে। এভাবেই আরও একটি বছর অতিবাহিত হলো।

পরের বছর হজ মৌসুমে আকাবার পূর্বনির্ধারিত স্থানে সমবেত হন ৭৫ জন মদিনাবাসী। এদের মধ্যে ছিলেন দুজন নারীও। তাঁরাও দ্বীনের ওপর শপথ গ্রহণ করেন। তাঁরা পাঁচটি বিষয়ে শপথ করেন। তা হলো-শিরক, ব্যভিচার, চুরি, সন্তান হত্যা ও মিথ্যা অপবাদ থেকে বেঁচে থাকা। অতঃপর তাঁদের জিজ্ঞেস করা হয়, যেকোনো অবস্থায় তাঁরা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত কি না? এ জিজ্ঞাসার জবাবে তাঁরা সকলে সম্মিলিতভাবে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে হাত রেখে শপথ করেন। তাঁরা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নেতা হিসেবে বরণ করে নেন। তাঁরা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মদিনায় আমন্ত্রণ জানান। ইতিহাসে এই ঘটনাকে ‘আকাবার শপথ’ নামে অভিহিত করা হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু আকাবার শপথের সময় বলেছিলেন- ‘হে আল্লাহর রাসূল, আমরা আপনার জন্য স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, সহায়-সম্পদ সমস্ত কিছু কুরবানি দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি।’ এই প্রতিশ্রুতিতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্বস্ত হন। মদিনাকে ইসলামি রাষ্ট্রের বুনিয়াদ হিসেবে প্রস্তুত করার ব্যাপারে এ শপথ গ্রহণকারী আনসারদের ভূমিকা অনেক বেশি।

■ **আহলে বদর**

২য় হিজরির ১৭ রমজান বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটি ইসলামের প্রথম সামরিক যুদ্ধ। বদর যুদ্ধে আবু জাহলের নেতৃত্বে এক হাজার সশস্ত্র কাফির যোদ্ধা অংশগ্রহণ করে। এক হাজার শত্রুসৈন্যের মোকাবিলায় মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেনাপতিত্বে

মাত্র ৩১৩ জন সাহাবী সামান্য পাথেয় নিয়ে কঠিন সম্মুখ লড়াই চালিয়ে যান এবং বিজয়ী হন। বদরে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের ৮৩ জন মুহাজির ও অন্যরা ছিলেন আনসার। আরবের তৎকালীন যুদ্ধরীতি অনুযায়ী এত কমসংখ্যক সেনা নিয়ে বিজয়ের স্বপ্ন দেখাও ছিল অবান্তর। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার রহমত ও সাহায্যে মাত্র ৩১৩ জন মুসলিম বীরযোদ্ধার হাতে সশস্ত্র কাফির বাহিনী পরাজিত হয়। মুসলিমদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু আবু জাহল এই বদরেই নিহত হয়। বদরের প্রান্তরে ৭০ জন কাফির নিহত হয়। মুসলিমদের ১৪ জন শাহাদাত বরণ করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, বদরের দিন নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদারত অবস্থায় দু'আ করছিলেন–

اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ .

"হে আল্লাহ, আমি আপনার প্রতিশ্রুতি পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ, আপনি যদি চান (কাফিররা জয়লাভ করুক), তাহলে আপনার ইবাদত করার মতো আর কেউ থাকবে না!"

আবেগঘন এ দু'আ শুনে আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু আর স্থির থাকতে পারলেন না! তিনি নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত ধরে বললেন-'হে আল্লাহর রাসূল, যথেষ্ট হয়েছে।' তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা কমারের ৪৫-৪৬ আয়াত দুটি পড়তে পড়তে সেনাশিবিরে তাঁর জন্য নির্মিত কুটি থেকে বের হলেন–

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ﴿٢٥﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَ اَمَرُّ

"শীঘ্রই দুশমনরা পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। মূলত কিয়ামতই হবে তাদের শাস্তির নির্ধারিতকাল। আর কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর।" [বুখারি: ২৭১৪]

বস্তুত হলোও তা-ই। আল্লাহ তা'আলা নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ কবুল করলেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বদরের ময়দানে আসমানি ফেরেশতাগণ লড়াইয়ে অংশ নিয়েছেন।

মহান আল্লাহ তা'আলা বদরের প্রান্তরে তাঁর অবারিত সাহায্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কুরআনে। মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছেন; অথচ সেদিন তোমরা ছিলে দুর্বল। অতএব, আল্লাহকে ভয় করো, যেন তোমরা শোকরগুজার হতে পারো।" [সূরা আলে ইমরান: ১২৩]

ইসলামের এ প্রথম যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের আল্লাহ তা'আলা ক্ষমার ঘোষণা

দিয়েছেন। অন্যান্য সাহাবীগণও বদরি সাহাবীদের অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরি সাহাবীদের বিশেষভাবে মর্যাদা দিতেন এবং ভালোবাসতেন। মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে বদরি সাহাবী হাতিব ইবনে আবি বালতা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘটনাটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন খুবই সন্তর্পণে। যেন এই বিজয় সম্পন্ন করতে যথাসম্ভব রক্তপাত এড়ানো যায়। কিন্তু হাতিব ইবনে আবি বালতা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এ গোপন সংবাদ মক্কাবাসীকে জানাতে একটি চিঠি লেখেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, মক্কায় আটকে পড়া তাঁর অসহায় পরিবার-পরিজনদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। কিন্তু তাঁর এই তৎপরতা ছিল শৃঙ্খলার লঙ্ঘন। আল্লাহ তা'আলা ওহি মারফত এই চিঠির খবর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানিয়ে দেন। ফলে হাতিব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু- চিঠিটি বাহকসমেত ধরা পড়ে। হাতিব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় অপরাধ স্বীকার করে নেন। সাহাবিদের কেউ কেউ বিশেষ করে উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হাতিব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে কঠোর শাস্তি দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এ বলে ক্ষমার করে দেন যে, হাতিব বদরি সাহাবী, আর আল্লাহ তা'আলা আহলে বদরকে মাফ করে দিয়েছেন। এরপর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

... فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ .

“তোমাদের (বদরি সাহাবীদের) জন্য জান্নাত অবধারিত।”

এ কথা শুনে উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছলছল নয়নে কেঁদে উঠে বললেন- ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জানেন।’ [বুখারি: ৩৬৯৪]

একদিন বদর যুদ্ধে শহিদ সাহাবী হারিসা ইবনে সুরাকা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর মা নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে জানতে চাইলেন-তাঁর ছেলে হারিসা যে বদরে শহিদ হয়েছে, তাঁর কী অবস্থা? সে জান্নাত পেয়েছে কি না? আমরা একটু ভাবি যে, মা তাঁর আদরের সন্তানের জান্নাত পাওয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন! মা তো এমনই হওয়া উচিত!

বদরি সাহাবী হারিসা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর স্থান কোথায় হয়েছে জানতে চাইলে নবীয়ে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মায়ের জবাবে বলেন–

... وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الفِرْدَوْسِ .

“সে তো জান্নাতুল ফিরদাউস লাভ করেছে।" [বুখারি: ৩৯৮২]

বদরের যুদ্ধে যারা শহিদ হয়েছেন, তাঁদের মর্যাদা আল্লাহ তা'আলার কাছে ঠিক কতখানি, তা নিম্নোক্ত আলোচনা থেকে কিছুটা অনুমান করা যাবে। বদরে শহিদ সাহাবীদের সম্পর্কে

লোকেরা যখন বলাবলি করছিল, আহা! অমুকের মৃত্যু হয়েছে, সে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন তাদের মন্তব্যের জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُوْنَ

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে তোমরা মৃত বলবে না; বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা (তাদের জীবিত থাকার ধরন সম্পর্কে) অবগত নও।" [সূরা বাকারা: ১৫৪]

■ মুজাহিদে দ্বীন

যে সমস্ত সাহাবী রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দ্বীন প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, তাঁরা সকলেই মর্যাদাবান। প্রথমে অংশগ্রহণকারীরা পরবর্তী সময়ের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। জিহাদে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ সে সকল সাহাবাগণের উপর মর্যাদাবান, যারা জিহাদে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাননি।

আল্লাহ তা'আলার নিকট জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা সকলের উপরে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَضَّلَ اللهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِينَ دَرَجَةً ...

"যারা সম্পদ ও জীবনের মাধ্যমে জিহাদ করে, আল্লাহ তাদেরকে ঘরে অবস্থানকারীদের ওপর উচ্চমর্যাদা দিয়েছেন।" [সূরা নিসা : ৯৫]

সাহাবীদের মধ্যেও যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ আলাদা মর্যাদা পেতেন। যদিও অন্ধ আর বৃদ্ধ ছাড়া জিহাদে অংশ নেননি, এমন সাহাবী তেমন একটা খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে প্রথম দিকের জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা পরবর্তীদের চাইতে বেশি।

সাহাবায়ে কিরামের অনন্য বৈশিষ্ট্য

সাহাবায়ে কেরামের উন্নত চরিত্রের সুরভিত ঘ্রাণ এমন যে, ঊষর পৃথিবীর বুকে যদি তা ছিটিয়ে দেওয়া হয়, তবে তাতেই সমস্ত সৃষ্টিকুল ঘ্রাণে মাতোয়ারা হয়ে যাবে। এ সৌরভ তাঁদের সমগ্র মানবগোষ্ঠী থেকে আলাদা করে অনন্য এক উচ্চতায় স্থান করে দিয়েছে। আকাশের অসংখ্য তারকার ওপর পূর্ণিমার চাঁদ যেমন স্বীয় আলোতে সমুজ্জ্বল; মানবতার বিশাল আকাশে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের অসংখ্য তারকার ভিড়ে সাহাবারা যেন ঠিক তেমন পূর্ণ বিকশিত চাঁদ। তাঁদের জীবনের ছোটো থেকে বড়ো, অসাধারণ থেকে সাধারণ সবকিছুই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও আপন মহিমায় ভাস্বর।

এমন মানুষদের নিয়ে লিখতে শুরু করলে কলম স্থবির হয়ে যায়! এত বিশাল অবদান তাঁদের, এত পরিপূর্ণ আলোয় উদ্ভাসিত তাঁদের জীবন, এত সম্মানের আসনে তাঁরা সমাসীন। তাঁদের সোনালি সে জীবনকে কোনো গ্রন্থে সংকুলান করা দুরূহ ব্যাপার। সে মহিমান্বিত জীবনের দীর্ঘ আলোচনার অতল দরিয়া থেকে কয়েক ফোঁটা তুলে ধরতে চেষ্টা করা হলো:

- **ঈমানি দৃঢ়তা**

সাহাবীদের প্রায় সবার জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত ছিল তাঁদের ঈমান আনয়নের সময়টি। ঈমান আনার পর মুহূর্তের মধ্যে তাঁরা জীবনের গন্তব্য ও বৈশিষ্ট্য আমূল পরিবর্তন করে ফেলতেন। তাঁদের জীবন ও জীবনের সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করার নিয়ামক শক্তির নাম 'ঈমান'। তাঁদের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও এর ব্যবহার, অথবা চলতি পথের প্রতিটি কদম, উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ, দৃষ্টির প্রতিটি চাহনি, হাতের প্রতিটি স্পর্শ, সবখানে ছিল ঈমানের দীপ্ত ছাপ। এ ঈমানের উপর তাঁদের দৃঢ়তা ছিল অবিশ্বাস্য রকমের। অসহনীয় কষ্ট আর সীমাহীন ভয়ের সম্ভাবনা-কোনো কিছু দিয়েই অবিশ্বাসী শক্তি তাঁদের একজনেরও ঈমানের দেওয়ালে চিড় ধরাতে পারেনি। তাঁদের বুকের ওপর চাপা দেওয়া হয়েছে জগদ্দল পাথর। টেনে-হিঁচড়ে মরুবালুকে তাঁদের পিঠের রক্ত দিয়ে করা হয়েছে রক্তিম। ধনীর আদরের দুলাল মুস'আব(রদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে করা হয়েছে ত্যাজ্য পুত্র! আরবের বুকে সবচেয়ে দামি আতর ব্যবহারকারী মুস'আব (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বেছে নিলেন মুসাফিরি জীবন! খাবারের ঠিক নেই, পোশাকের বালাই নেই। সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম নেওয়া সে মুস'আব ইবনে উমাইর (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সবই ছেড়েছেন, কেবল ঈমান ছাড়েননি। আহা মুসআব! আহা আল্লাহর রাসূলের সাহাবিগণ!

তাঁদের এক একটি অঙ্গ কেটে পৃথক করা হয়েছে, জলন্ত কয়লার উপর তাঁদেরকে ফেলে দেওয়া হয়েছে, শূলিতে বসিয়ে তীর নিক্ষেপ করা হয়েছে, অকথ্য নির্যাতনে নির্যাতিত হয়েছেন, রক্ত দিয়ে এ তৃষিত জমিন সিক্ত করেছেন, জবাই করা প্রাণীর মতো ছটপট করতে করতে প্রাণ নিঃশেষ হয়েছে, কিন্তু ঈমান বিসর্জন দেননি।
পাহাড় যেমন করে অনড়-অবিচল হয়ে জমিনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, সাহাবীদের হৃদয়জমিনে ঈমান পাহাড়ের চাইতেও কঠিনভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। তাঁদের ঈমান ছিল পর্বতপ্রমাণ। কাতাদা রহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন আবদুল্লাহ ইবনে উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে সাহাবীদের ঈমানের বৈশিষ্ট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি বলেন–

الْإِيْمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ أَعْظَمُ مِنَ الْجِبَالِ.

"তাঁদের হৃদয়ে ঈমান পাহাড়ের চেয়েও সুদৃঢ় ছিল।" [মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক: ২০৬৭১]

সাহাবীদের পুরো জীবনটাই ছিল অটল ঈমানের প্রতিচ্ছবি। ইবাদত-বন্দেগি, লেনদেন, চলাফেরা, আখলাক-চরিত্র, জীবনের সর্বত্র ছিল তাঁদের সুদৃঢ় ঈমানের পরিপূর্ণ ছাপ।

সা'দ ইবসে আবি ওয়াক্কাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মাকে খুবই ভালোবাসতেন। তিঁনি মায়ের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ও সদাচারী ছিলেন। সা'দ ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর মা তাঁকে বললেন- 'তুমি এ কী দ্বীন গ্রহণ করেছো? তুমি তা ত্যাগ করো, নতুবা আমি পানাহার ছেড়ে দেবো। আমি না খেয়ে মারা গেলে মানুষ তোমাকে মাতৃহন্তা বলবে।" সা'দ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন–

لَا تَفْعَلِي يَا أُمَّ إِنِّي لَا أَدَعُ دِيْنِي هَذَا لِشَيْءٍ

"মা, আপনি এমন করবেন না! আমি আমার দ্বীন কিছুতেই ত্যাগ করতে পারব না।"
সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর মুখে এ কথা শুনে তাঁর মা দুই দিন না খেয়ে কাটাল। এতে তিনি ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েন। তিনি ভেবেছেন, এই অবস্থা দেখলে তার মা-ভক্ত ছেলের অন্তরে দুর্বলতা সৃষ্টি হবে এবং মাকে বাঁচানোর জন্য ছেলে তাঁর দ্বীন ইসলাম বর্জন করবে! কিন্তু সা'দ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবার আরও পরিষ্কার ভাষায় জানালেন–

يَا أُمَّهْ ، تَعْلَمِينَ وَاللهِ يَا أُمَّهْ لَوْ كَانَتْ لَكِ مِائَةُ نَفْسٍ فَخَرَجَتْ نَفْسًا نَفْسًا. مَا تَرَكْتُ هُذَا لِشَيْءٍ إِنْ شِئْتِ فَكُلِي وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَأْكُلِي

"মা। আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহর শপথ! আপনার যদি একশত প্রাণ থাকত আর সবগুলো একের পর এক বের হয়ে যেত, তবুও আমি আমার দ্বীন ত্যাগ করতাম না। এখন আপনার ইচ্ছে হলে খেতে পারেন আর ইচ্ছে না হলে নাও খেতে পারেন।" [মুসলিম: ১৭৪৮]

খাব্বাব ইবনে আরাত রদ্বিয়াল্লাহু আনহু জাহেলি যুগে কর্মকার ছিলেন। সেই সুবাধে আস ইবনে ওয়াইলের কাছে তাঁর পাওনা ছিল। আস-এর কাছে পাওনা চাইতে গেলে সে বলল– 'আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদের সঙ্গে কুফরি না করলে আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না।" প্রত্যুত্তরে খাব্বাব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন—

لَا ، وَاللهِ لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى يُمِيتَكَ اللهُ ثُمَّ يَبْعَثَكَ.

"আল্লাহর শপথ! তুমি যদি মারা যাও, তারপর পুনরায় জীবিত হও, তবুও আমি মুহাম্মাদ সা.-এর সঙ্গে কুফরি করব না।" [বুখারি: ২২৬৪]

সাহাবায়ে কেরামগণ ঈমানের এমন স্বাদ পেয়েছিলেন, যার ফলে দুনিয়ার সব ভালোবাসাকে আনন্দচিত্তে বিসর্জন দিতে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন। মা, প্রিয়তমা, সহায়-সম্পদ কোনো কিছুই দ্বীনের প্রশ্নে তাঁদের কাছে পাত্তা পায়নি। ঈমানের পরিপূর্ণ স্বাদ লাভের যাবতীয় উপকরণ তাঁদের মাঝে বিদ্যমান ছিল। আর এ উপকরণ যার কাছে আছে, অন্য কোনো কিছুই তাকে ঈমানের পথ থেকে দূরে সরাতে পারবে না। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে, সে ঈমানের সুমিষ্ট স্বাদ পাবে—

أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ.

" ১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সব থেকে প্রিয় হওয়া। ২. কাউকে শুধু আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। ৩. কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো ঘৃণ্য মনে করা।" [বুখারি: ১৫]

সাহাবায়ে কেরামের ইখলাস ও আমলি জীবনের দিকে তাকালে আল্লাহ তা'আলা বর্ণিত সিদ্দিকিনদের বৈশিষ্ট্য ভেসে ওঠে। এমন সুদৃঢ় ঈমানের সুরক্ষিত দেওয়াল তাঁরা নির্মাণ করেছেন–যা আর কেউ পারেনি; পারবেও না।

■ কুফর মোকাবিলায় আপসহীন

আল্লাহ তা'আলা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে পবিত্র কুরআন ও পূর্বের কিতাবে পাঁচটি মৌলিক দিক তুলে ধরেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ؕ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَي الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۛۖۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۛۚ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰي عَلٰي سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাঁদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাঁদের চেহারায় থাকবে সিজদার চিহ্ন। তাওরাতে তাঁদের এই বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। আর ইনজিলে তাঁদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছের মতো-যা হতে

নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর ওটা শক্ত ও পরিপুষ্ট হয়। অতঃপর সেটি কাণ্ডের ওপর এমন দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায়-যা কৃষককে আনন্দিত করে। এভাবে আল্লাহ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তায়ালা তাঁদের ক্ষমা ও পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।" [সূরা ফাতহ: ২৯]

কুফরের যেকোনো চ্যালেঞ্জকে সাহাবায়ে কেরাম সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করেছেন। তাঁদের রক্ত, বংশ, সম্পর্ক ও আত্মীয়তা-কোনো কিছুই দ্বীনের ব্যাপারে তাঁদেরকে এতটুকুন টলাতে পারেনি। দ্বীনের উপর এগুলোকে তাঁরা পাত্তাই দেননি। কুফরি মতবাদের হাজার হাজার সৈন্যপরিবেষ্টিত অবস্থায়ও তাঁরা ভেঙে পড়েননি; তাঁরা ছিলেন নিঃশঙ্ক, নির্ভয়। কেবল নবীয়ে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাতেই তাঁরা কুফরের বিরুদ্ধে শক্ত প্রাচীর ছিলেন এমন নয়; বরং নবীপরবর্তী জীবনেও তাঁরা কুফরের বিরুদ্ধে অবিচল সংগ্রামের কাব্য রচনা করে গিয়েছেন। ইতিহাসের পাতা থেকে একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক—

ইরানের রাজধানী পারস্য। রুস্তমের দরবারে ১০ সহস্র সৈন্যের খোলা তরবারি মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঝনঝনিয়ে উঠল। ১০ হাজারের বিপরীতে মাত্র ৭০ জন সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে। ভাবতে পারেন? হাজার সংখ্যার বিরুদ্ধে মাত্র ৭০ জন মুসলিম। সল্প এ সংখ্যার সেনাদলের নেতৃত্বে দণ্ডায়মান রাসূলের প্রিয় সাহাবি মুসলিমদের সেনাপতি খালিদ সাইফুল্লাহ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

সাহাবীগণ হক ও বাতিলের ময়দানে আপন রক্তের ওপর তরবারি চালাতেও এতটুকু দ্বিধা করেননি। বদরের কঠিন দিনে ভাই ভাইয়ের হাতে নিহত হয়েছে। আবু উবায়দা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় পিতাকে বদরের যুদ্ধে খোলা তরবারি হাতে নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে অগ্রসর হতে দেখে হত্যা করেন। কুফরির মোকাবিলায় কোনো জড়তাই তাঁদের আচ্ছন্ন করতে পারেনি। কিংবা ঈমানের প্রশ্নে কোনো সম্পর্ক তাঁদের সামনে হয়ে দাঁড়ায়নি বাধার দেয়াল।

- **নিজেদের পরস্পরের প্রতি রহমদিল**

সাহাবিদের হৃদয় ছিল একে অপরের প্রতি সংবেদনশীল। এখানে ছিল না গোত্রীয় কোনো পরিচয়। মুখ্য ছিল না বংশীয় কোনো মর্যাদা। সকলে আবদ্ধ হয়েছেন এক পরিচয়ে–ভাই। ভাইয়ের প্রয়োজনকে তাঁরা সর্বদা নিজের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁরা একে অপরকে ভালোবাসতেন কেবলই আল্লাহর জন্য। কাউকে ঘৃণা করার প্রয়োজন হলে ঘৃণাও করতেন

আল্লাহ তা'আলার জন্যই।

আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমানের দাবির অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে, মুসলিম ব্যক্তি কাউকে ভালোবাসবে শুধু আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং কাউকে ঘৃণাও করবে শুধু আল্লাহ তা'আলার জন্য। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ وَأَعْطَى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ.

“যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসল, আল্লাহর জন্যই কাউকে ঘৃণা করল; আর আল্লাহর জন্য কাউকে কিছু দিলো এবং আল্লাহর জন্যই কাউকে কিছু দেওয়া থেকে বিরত থাকল, সে ব্যক্তি নিজ ঈমানকে পূর্ণতা দান করল।” [আবু দাউদ: ৪৬০৭]

সাহাবায়ে কেরাম ঈমানের এই দাবি পূরণে ছিলেন অনুপম অগ্রগামী। মক্কার নিঃস্ব মুহাজিরদের ভাই হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়ার জন্য রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দেন আনসারদের। এই নির্দেশ বাস্তবায়নে মদিনার আনসারগণ ভ্রাতৃত্বের যে নজির দুনিয়ার সামনে পেশ করলেন, ইতিহাসের পাতায় এমন নজির আর দ্বিতীয়টি নেই। শুধু ভাই হিসেবে নয়; বরং নিজের বাড়ি-ঘর, স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিতে মুহাজির ভাইকে আনসারগণ শরিক করে নিয়েছেন; এমনকি অনেকে অর্ধেক মালিকানা দিয়েছেন। অথচ আমরা নিজ ওয়ারিশদেরই মিরাস থেকে বঞ্চিত করছি। হায় আফসোস!

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা একে অপরের প্রতি এতটাই দয়ার্দ্র ছিলেন যে, তাঁদের অনেকের বলার মতো তেমন অর্থকড়িও ছিল না, তবে তাঁরা সাথীদের মেহমানদারিতে যে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা কিয়ামত অবধি আর কেউ উপস্থাপন করতে পারবে না। মেহমানদারির একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ বুখারির বর্ণনায় এসেছে এভাবে— এক ব্যক্তি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন। তিনি ছিলেন ক্ষুধার্ত। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের নিকট মেহমানের আগমনের খবর পাঠান। তাঁরা জানালেন, ‘আমাদের নিকট পান করার জন্য পানি ছাড়া আর কোনো খাবার নেই।’ তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন– ‘তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে লোকটিকে সাথে নিয়ে যাবে এবং মেহমানদারি করবে।’ তখন আনসারি সাহাবী আবু তালহা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু

বললেন– ‘আমি মেহমানদারি করব, হে আল্লাহর রাসূল।’আবু তালহা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু লোকটিকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন–'আল্লাহর রাসূলের মেহমানের মেহমানদারির ব্যবস্থা করো।' স্ত্রী বললেন–'আমাদের ঘরে কেবল বাচ্চাদের খাওয়ার পরিমাণ খাবার ছাড়া আর কিছুই নেই।' মেহমানের জন্য কিছু একটা বন্দোবস্ত তো করতেই হবে। আবু তালহা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। অতঃপর খাবার পরিবেশন করলেন মেহমানের সামনে। মেহমানের জোরাজুরিতে নিজেরাও

খেতে বসলেন। কিন্তু খাবার শুরু করেই তাঁরা কৌশল করে বাতি নিভিয়ে দিলেন। অন্ধকারে তাঁরা দুজনই খাওয়ার অভিনয় করলেন, যাতে মেহমান মনে করেন যে, তাঁরাও খাচ্ছেন। অন্ধকার দস্তরখানে দুজন খাওয়ার ভান করলেন আর মেহমান খাবার খেতে লাগল। আবু তালহা ও তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের ছেলেমেয়েরা সেদিন না খেয়েই রাত যাপন করলেন। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ওহি করে জানিয়ে দিলেন–

... وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓي اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚ

"তাঁরা নিজেরা অভাবী হওয়ার পরও নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়। আর যাদেরকে মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই তো সফলকাম।" [সূরা [হাশর: ৯]

আমরা যারা অনাহুত মেহমান বা একটু দূরের আত্মীয়স্বজন এলে তাদের মেহমানদারিকে কষ্টকর মনে করি, তাদের জন্য রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবু তালহা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হোক অনুপ্রেরণার উৎস।

■ তাহাজ্জুদগুজার

কিয়ামুল লাইল তথা তাহাজ্জুদগুজারি সাহাবায়ে কেরামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁদের ব্যাপারে বলা হয়েছে–তাঁরা রাতের দরবেশ ও দিনের মুজাহিদ। দিনের বেলায় তাঁরা দাওয়াতের জমিনকে ঘাম দিয়ে ও জিহাদের ময়দানকে রক্ত দিয়ে সিক্ত করে এবং রাতের বেলা তাঁরা জায়নামাজকে অশ্রু দিয়ে সিক্ত করে। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন-

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

"রাতের বেলা তাঁদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং তাঁরা তাঁদের রবকে ভয় ও আশা সহকারে ডাকতে থাকে। (তাঁদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে,) তাঁরা আমার দেওয়া রিজিক থেকে (আমার পথে) খরচ করে।" [সূরা সাজদা: ১৬]

সাহাবীগণ সকল সালাতে ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। আবশ্যক সালাত ছাড়াও তাঁরা সকলেই ছিলেন তাহাজ্জুদগুজার। কেননা, কেউ যদি আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা হতে চায়, তাহলে তাকে রাতের কিছু অংশ আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। আল্লাহ তা'আলা প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

وَ الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَ قِيَامًا

“তাঁরা তাঁদের রবের উদ্দেশ্যে রুকু ও সিজদায় রাত অতিবাহিত করেছে।” [সূরা ফুরকান: ৬৪]

■ সৃষ্টি থেকে বে-নেয়াজ

সাহাবীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁদের প্রয়োজন পূরণে তাঁরা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারো কাছে হাত পাতেননি। সমস্ত প্রয়োজন তাঁরা পেশ করতেন মহামহিম রবের দুয়ারে। মহান আল্লাহ তা'আলা সাহাবীদের অনুগ্রহ কামনায় একনিষ্ঠতার বিষয়টি সত্যায়ন করে বলেন–

... يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ .

“তাঁরা আল্লাহর সন্তোষ ও অনুগ্রহ কামনা করে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। এরাই সত্যনিষ্ঠ।” [সূরা হাশর: ৮]

কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি এমনকি সমগ্র পৃথিবীর সন্তুষ্টি সাহাবীদের নিকট বিবেচ্য বিষয় ছিল না। দুনিয়ার কোন জাতি কী চায়, কীভাবে চলে, সেসবের প্রতি তাঁরা ভ্রূক্ষেপ করেননি। আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার প্রয়োজনে সমগ্র দুনিয়ার বিরাগভাজন হওয়ার ঝুঁকি নিতে তাঁরা ছিলেন সদা প্রস্তুত। পৃথিবীর সকল পার্থিব সামগ্রী আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির তুলনায় তাঁদের নিকট ছিল পথের ধূলার চাইতেও হালকা। তাঁদের স্বজন ও স্বদেশবাসী যখন তাঁদের বিরুদ্ধে অবরোধ কার্যকর করেছে এবং কেড়ে নিয়েছে বেঁচে থাকার শেষ সম্বলটুকুও, তখন তাঁরা অরণ্যের পাতা খেয়ে দিন গুজরান করেছে। নাফরমানির শর্তে এ ক্ষুধার্ত সাহাবীগণ খাদ্যের একটি দানা অথবা পিপাসায় এক আজলা পানিও পান করেননি। এমন কোনো সাহাবীকে পাওয়া যাবে না, যিনি বাতিলের অনুকম্পায় দানাপানি গ্রহণ করে দুনিয়ার আয়েশি জীবনে বুঁদ হয়ে ছিলেন। লালসার পিচ্ছিল এ চোরাগলি থেকে তাঁরা খুব সন্তর্পণে হেঁটে গেছেন জান্নাতের পথে। মহিয়ান শাহাদাতের মৃত্যুই যাদের ধ্যান আর লালিত স্বপ্ন, কেন তাঁরা দুমুঠো খাবারের জন্য বেছে নেবেন যিল্লতির জীবন!

■ চেহারায় বন্দেগির চিহ্ন

সাহাবীদের চেহারায় ছিল বন্দেগির চিহ্ন ও প্রভাব। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

...سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ۚ

“তোমরা তাঁদের চেহারায় দেখবে সিজদার চিহ্ন।” [সূরা ফাতহ: ২৯]

উপর্যুক্ত আয়াতে কপালে সিজদার কালো দাগ বোঝানো হয়নি, যেমনটা কেউ কেউ মনে করে থাকেন। বোঝানো হয়েছে মূলত সিজদা ও তাকওয়ার কারণে তাঁদের চেহারায় এক ধরনের জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের দিকে প্রথম দৃষ্টিতেই এ কথা বোঝা যেত যে, এই ব্যক্তিবর্গ হলেন আল্লাহওয়ালা মানুষ। প্রবাদ আছে– Face is the index of minds.
“চেহারা মনের সূচিপত্র।” আয়াতে উল্লিখিত 'আছারিস সুজুদ' তথা সিজদার জ্যোতি এক নুরানি আভা বিশেষ। কালো মানুষের চেহারায়ও সে উজ্জ্বল আভা ছড়িয়ে পড়ে। মনের পবিত্রতা, আমলের বিশুদ্ধতা, ঈমানের দৃঢ়তা সাহাবীদের চেহারায় প্রতিফলিত হতো। তাঁদের দর্শনে মানুষের মন শ্রদ্ধায় নত হতো। আর তাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অন্যরা হতো অভিভূত।

■ কুরআনের সমুদ্রের জলচর

সাহাবায়ে কেরামের বহু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো–তাঁরা ছিলেন কুরআনের স্বজন।
সাহাবীদের জীবনে কুরআন মাজিদই ছিল অধ্যয়নের মূল বিষয়। তাঁরা দ্বীনের এ নির্ভেজাল উৎস থেকে সরাসরি হিদায়াত গ্রহণ করেছেন। যে কিতাবের প্রতিটি বাক্য, শব্দ, এমনকি বর্ণ পর্যন্ত মানবজাতির হিদায়াতের সাথে সম্পর্কিত। যেই কিতাবে নেই সন্দেহজনক একটি বর্ণও। হিদায়াতের আলোক মশালের নাম আল কুরআন। মহামহিম রব ইরশাদ করেন-
هٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ
“এই (কুরআন) হিদায়াত দানকারী। আর যারা তাদের রবের আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।” [সূরা জাসিয়া: ১১]
সাহাবীদের ঈমানের ওপর অবিচল টিকে থাকার জন্য যে অমিয় সুধা অনুপ্রেরণা আর সাহস জুগিয়েছে, তা কিন্তু এই কুরআন মাজিদই। মক্কার কাফিররা অবাক নয়নে তাকিয়ে থাকত এই ভেবে যে–কীসের শক্তিতে এত নির্যাতনের পরও শক্ত পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে বিলাল! আর কোন সুরের মূর্ছনায় মুহূর্তে পরিবর্তন হয়ে গেল উমারের শক্ত হৃদয় কপাট! কীসের টানে মুস'আব ইবনে উমাইর তাঁর অঢেল সম্পদ ফেলে দীনতার জীবন বেছে নেন! সে সঞ্জীবনী সুধার নাম তো পবিত্র কুরআন। যা লাওহে মাহফুজ থেকে বান্দার জন্য আল্লাহ তা'আলার খোলা চিঠি। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰي رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۚۖ

"নিশ্চয় মুমিনরা এমন যে, যখন তাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তখন তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়। আর তারা তাদের রবের উপর নির্ভর করে।" [সূরা আনফাল: ২]

সাহাবীদের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল 'আল কুরআন'। সাহাবীগণ ছিলেন কুরআন সমুদ্রের জলচর। অথচ আমাদের কুরআন পড়ে থাকে সেলফের একেবারে উপরে। হয়তো মাকড়সার জাল সেখানে বাসা বেঁধেছে। পরিবারের কেউ মারা গেলে হয়তো একদিনের জন্য সেটি নামাবো! অথবা বছর ঘুরে রমাদ্বনে কুরআনের সাথে হয়তো একটু দেখা হয়। বরং এটাও অনেকের হয়ে উঠে না। সভ্যতার কত জ্ঞান আমরা অর্জন করি, অথচ কুরআনের সাথে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সম্পর্ক নেই! আবার সেই আমরাই দুনিয়া যেন আবার খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে আবর্তন করে, সেই স্বপ্নও দেখি!

■ **ইত্তিবায়ে রাসূল ﷺ**

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং একমাত্র তাঁকেই অনুসরণ করা সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের অনন্য বৈশিষ্ট্য। সাহাবায়ে কেরাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি বিষয়ে, প্রতিটি মুহূর্তে একমাত্র নবীয়ে আকরাম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ইত্তিবা ও অনুসরণ করেছেন। জীবনের আনন্দঘন মুহূর্ত বা কঠিন কোনো বেদনা, কোনো রোমাঞ্চকর ঘটনা বা সভ্যতার চাকচিক্য কোনো কিছুই সাহাবীদের দৃষ্টিকে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ থেকে গাফিল করে দেয়নি। শয়নে ও স্বপনে, নিদ্রা ও জাগরণে রাসূলে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই ছিলেন তাঁদের দিশারি।

এক প্রশ্নের জবাবে আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন– "রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আমাদের সন্তান, পিতা-মাতা, ধনসম্পদ, এমনকি তৃষ্ণার্ত বেদুইনের কাছে ঠান্ডা পানি যেমন, তার চাইতেও বেশি প্রিয়।"

সাহাবারা কেন নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রাণপণ অনুসরণ করবেন না! নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অনুসরণ করা তো আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা অর্জনের একমাত্র উপায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

“(হে নবী) বলেন–যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আ-লি 'ইমরান: ৩১]

নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ পালনে সাহাবারা ছিলেন নিষ্ঠাবান। কোনো প্রকার ওজর পেশ করা কিংবা দায়সারা গোছের দায়িত্বপালন, সম্ভব ও অসম্ভবের যুক্তি পেশ-এসব উদাহরণ সাহাবীদের জীবনে অনুসন্ধান করে খুঁজে পাওয়া যায় না। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সিদ্ধান্তের সামনে তাঁরা নিজেদের জবান, জ্ঞান, আকল, শক্তি, যোগ্যতা, সহায়-সম্পদ, জীবন-মরণ সবকিছুকে অকাতরে ও বিনয়ের সাথে হাজির করেছেন। বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত পরামর্শ সভায় সা'দ ইবনে মু'আয রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন–

“আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার জীবন! ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি আমাদের মহাসাগরে ঝাঁপ দিতে বলেন, আমরা বিনা প্রতিবাদে মরণসমুদ্রে ঝাঁপ দেবো।”

■ হাদিসের আমানতদার

একমাত্র নবী-রাসূলগণই হলেন মাসুম। আল্লাহ তা'আলার মহান হিকমত অনুযায়ী তাঁরই বিশেষ হেফাজতের কারণে নবি-রাসূলগণ নিষ্পাপ। নবী-রাসূলগণ ব্যতীত কোনো মানুষই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। মানুষের প্রকৃতির একটি বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ভুল হওয়া। অতএব, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণও মাসুম ছিলেন না। আর এতে রয়েছে উম্মতের কল্যাণও। ভুলের পরে করণীয় কী-সে বিষয়ক শিক্ষা সাহাবায়ে কেরামের জীবন থেকেই আমরা পাই। ভুল করার পর কোনো ব্যক্তি যখন আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরে আসতে চায়, তখন তার সাথে আমাদের আচরণ কী হবে, সেই শিক্ষাও আমরা পাই ভুলের স্বীকারোক্তি নিয়ে আসা সাহাবায়ে কেরামের সাথে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মপদ্ধতি থেকে। এই ত্রুটিবিচ্যুতি যদি সাহাবায়ে কেরামের জীবনে না ঘটত এবং নববী মাপকাঠিতে যদি তাঁরা পর্যালোচিত না হতেন, উম্মত কোথায় গিয়ে তালাশ করত এর সমাধান!

তবে একটি বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এই বিষয়ে তাঁদের কোনো ভুল নেই। সেটি হলো– হাদীস বর্ণনা। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনার বিষয়ে সমস্ত সাহাবী মাহফুজ ছিলেন। হাদীস বর্ণনার বিষয়ে তাঁরা ছিলেন খুবই সচেতন ও সর্বোচ্চ আমানতদার। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবারা ছিলেন হাদীসের সবচেয়ে বড়ো রক্ষক। কেননা, তাঁরা এর ভয়াবহতা সম্পর্কে ছিলেন পূর্ণ ওয়াকিবহাল। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারংবার বলেছেন–

مَنْ يَقُلْ عَلَى مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কথা বলবে, যা আমি বলিনি, তাহলে সে জাহান্নামকে নিজের আবাসস্থল বানিয়ে নিলো।" [বুখারি: ১০৯]

আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَا تَكْذِبُوا عَلَى، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَى فَلْيَلِجِ النَّارَ .

"তোমরা আমার নামে মিথ্যা বলবে না; কারণ, যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলবে, জাহান্নামে যাবে।" [বুখারি: ১০৭]

হাদীসে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমানত খিয়ানত করা, হাদীসের মধ্যে কোনো নিজস্ব শব্দ সংযুক্ত করা বা কোনো শব্দ ইচ্ছাকৃত বাদ দেওয়া, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো কথাকে গোপন করা অথবা এমন কোনো কথাকে হাদীসে বলে অভিহিত করা-যা তিঁনি বলেননি, এই ভয়াবহ অপরাধ থেকে সমস্ত সাহাবী সমগ্র জীবন নিজদের হিফাজত করেছেন। এ বিষয়ে গোটা উম্মতের ইজমা এই যে– 'সমস্ত সাহাবী ছিলেন আদ্বিল (হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে পূর্ণ আমানতদার)।'

লক্ষাধিক সাহাবীর মধ্যে সাধারণ একজন সাহাবীও এমন পাওয়া যায়নি, যিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের আমানত খিয়ানত করেছেন অথবা কিছু সংযোজন-বিয়োজন করেছেন। এই বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। এ মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই সাহাবীদের হাতে দ্বীন অবিকৃত অবস্থায় ছিল এবং তা দুনিয়ার কাছে অবিকৃত অবস্থায় পৌঁছে গেছে।

■ মুজাহিদে দ্বীন

সাহাবায়ে কেরামের কর্মব্যস্ত জীবন কেটেছে মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে এবং তাঁর আনীত দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। কেননা, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হওয়ার জন্য ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁদের বাছাই করা হয়েছে। বেঁচে থাকার জন্য তাঁরা কোনো না কোনো পেশা অবলম্বন করতেন, কিন্তু তাঁদের জীবন-লক্ষ্য ছিল দ্বীন। তাঁদের পারিবারিক ব্যস্ততা, ব্যাবসা কিংবা চাকুরি কোনো কিছুই তাঁদের জীবনকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি। এ দ্বীনের প্রয়োজনে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত সংসারও বিরান করেছেন, স্বজনদের বিরাগভাজন হয়েছেন, জীবনের ওপর মরণের ঝুঁকি গ্রহণ করেছেন, সন্তানদের এতিম করেছেন-এত কিছুর পরও দ্বীনের ক্ষতি তাঁরা বরদাশত করেননি।

খন্দকের যুদ্ধ চলছে, কনকনে শীতের মধ্যে সাহাবীরা পরিখা খনন করছেন, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের জন্য দুআ করছিলেন–

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ .

“হে আল্লাহ, আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। আপনি মুহাজির ও আনসারদের মাফ করে দিন।”

নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দু'আ শুনে সাহাবীরা আবৃত্তি করে উঠলেন–

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا ، عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا أَبَدًا.

“আমরা তো তারাই, যারা মুহাম্মাদের হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছি এই মর্মে যে, যতদিন আমরা বেঁচে থাকব, ততদিন জিহাদ করে যাব।” [বুখারি: ৪০৯৮]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত ও প্রদর্শিত সে দ্বীন আমাদের কাছে মওজুদ আছে, কিন্তু সে দ্বীনকে বিজয়ী করার সংগ্রামের এমন আমরণ প্রতিশ্রুতি আমাদের মাঝে বিরল। আমরা আমাদের পরিজন, সংসার ও জীবনের মান বৃদ্ধি নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছি। দ্বীন নিয়ে সময় দেওয়ার মতো সময় আমাদের নেই। হায়! সে সময় কবে আসবে, যেদিন সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদি সিসাঢালা প্রচীরের মতো দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কাতারবন্দি হবে। উম্মতের আলিমগণ মানুষদেরকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন। ইমামগণ মিহরাব থেকে নামাজের ফজিলতের পাশাপাশি প্রয়োজনে জিহাদের ডাক দেবেন। মাশায়েখরা দ্বীনি আন্দোলনের তথা জিহাদের উপর বাই'আত করাবেন।

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি আমাদের দায়িত্ব

সাহাবায়ে কেরামের কাছে আমাদের ঋণ অপরিমেয়। আমাদের কাছে হিদায়াতের আলো পৌছে দেওয়ার জন্য তাঁরা রেখেছেন অনন্য অবদান। তাঁদের প্রতি আমাদের রয়েছে সুনির্দিষ্ট করণীয়। এ প্রসঙ্গে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর এ উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন– “তাঁদেরকে চেনো, সম্মান করো এবং তাঁদের অনুসরণ করো।”

■ সাহাবীদের জীবন অধ্যয়ন

সাহাবায়ে কেরামের জীবন সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। সাহাবীদের জীবন সাম্রাজ্যে বিচরণ করতে হবে। সাহাবীদের সেই রোমাঞ্চকর জীবন সংগ্রহ বিস্তৃত ও ব্যাপক ব্যাপার।

একেকটি জীবন যেন একেকটি জগৎ। উম্মতকে করতে হবে তা থেকে জীবন চলার পাথেয়।

সাহাবীদের জীবন সমুদ্রের তলদেশ থেকে আহরণ করতে হবে এমন সব মণিমাণিক্য—যা আমাদের করবে প্রাচুর্যময় ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। আজ আমরা অন্য যাদের জীবনকে মহান বলি, সাহাবীদের জীবনসমুদ্রে তাঁদের জীবননদীগুলো নিজেদের দীনতায় আত্মাহুতি দিয়ে নিশ্চল হয়ে যাবে।

■ সাহাবীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

সাহাবীদের জীবন আমাদের জন্য সম্মানের ও মর্যাদার। আমরা যখন সাহাবীদের নাম উচ্চারণ করি, তখন তাঁদের নামের শেষে পড়ি রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম—মহান আল্লাহ তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট। তাঁদের মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের থাকতে হবে সচেতন ও আন্তরিক।

■ সাহাবীদের জীবন অনুসরণ

সাহাবীদের দীপ্ত জীবন আমাদের জন্য আদর্শ। সকল যুগের উম্মতকে রাসূলে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের জীবন-সৌন্দর্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অবহিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

... ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ ...

“তাদের এই বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে তাওরাতে। আরও আলোচিত হয়েছে ইনজিলে।” [সূরা ফাতহ : ২৯]

সাহাবীদের সোনালি জীবন জানার পরও যদি আমরা তা গ্রহণ করতে রাজি না হই, তবে তা নিজেদের উপর জুলুম ছাড়া আর কীই-বা হতে পারে? সাহাবীদের এই জামায়াত ছিলেন সিরাতে মুস্তাকিমের উপর অটল-অবিচল। কোনো ব্যক্তি যদি জান্নাতে যেতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই জান্নাতিদের পথ অনুসরণ করেই আগাতে হবে। আর সাহাবায়ে কিরাম হচ্ছেন এমন জামায়াত, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির সুসংবাদপ্রাপ্ত। আর আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কীই-বা হতে পারে!

বাস্তবতা

মুসলিম বিশ্ব আজ রক্তাক্ত, শৃঙ্খলিত, বেদনাক্লিষ্ট, পরাভূত ও হতাশার তিমিরে নিমজ্জিত। এত বিশাল ভূখণ্ড, এত বিপুল জনগোষ্ঠী, এত অপরিমেয় প্রাচুর্য ও অঢেল সম্পদ এমনকি

পরমাণু শক্তির অধিকারী হওয়ার পরও মুসলিম দুনিয়ায় অমানিশার ঘোর আজও কাটেনি। জানি না, রাত পোহাবার আর কত দেরি।

আমাদের কত জনপদ বিরান হয়ে যাচ্ছে, উদ্বাস্তুরা সকলেই আমাদের আপনজন! আমাদের শিশুরা বিনা চিকিৎসায় অকাতরে মারা যাচ্ছে! আমাদের মা ও বোনেরা সম্ভ্রম রক্ষায় সন্ত্রস্ত! আমাদের বয়ে যাওয়া রক্তের স্রোত সৃষ্টি করছে সাগরের। সময় এখন এমন, আমাদের আলমিরায় কী আছে তা দস্যুদের খুলে দেখাতে হবে। আমাদের ভাইদেরকে হায়েনাদের হাতে তুলে দিতে হবে। নতুবা তারা সব কিছু গুঁড়িয়ে দেবে। হায়! আমরা যেন মানুষ নই! আরও বেদনাদায়ক সত্য হলো–মুসলিম দুনিয়ার শাসকদের মাথাগুলোই সাম্রাজ্যবাদীরা কিনে নিয়েছে বিলিয়ান বিলিয়ন ডলার, নগ্ন নারীর স্পর্শ, আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও চটকদার খেতাবের বিনিময়ে। সাম্রাজ্যবাদীরা এ পদলেহী মুসলিম দুনিয়ার নেতাদের ব্যবহার করছে মুসলিমদের পুনর্জাগরণী আন্দোলনকে থামিয়ে দিতে। মুসলিমরা আজ নিজ দেশেও যেন ভিনদেশি। নিজ ঘরেও আজ তাদের নিরাপত্তা সংকট বিরাজমান! আলজেরিয়া, মিশর, সিরিয়া, সৌদি আরব ও বাংলাদেশের কারাগারে আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের সৈনিকদের ওপর নির্যাতনের স্টিমরোলার চলেছে, চলছে। সমস্ত তথাকথিত মূলধারার মিডিয়াকে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের পুনর্জাগরণকে থামিয়ে দিতে সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের সব ব্যবস্থাপনা বিধ্বস্ত করে দিয়েছে।

প্রচলিত ব্যবস্থায় এনজিও নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অর্থ, অস্ত্র ও গণমাধ্যম সবকিছুকে ব্যবহার করে এমন এক জটিল পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে, ইসলাম যেন সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে টিকে না থাকে।

সর্বগ্রাসী এই ভয়াবহতা মোকাবিলায় আমাদের পুনরায় আমাদের প্রথম যুগের বৈশিষ্ট্যাবলিকে ধারণ করতে হবে। ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন– "আমাদের প্রথম যুগের সমস্যাগুলো যে পদ্ধতিতে সমাধান হয়েছে, শেষ প্রজন্মের সংকটও একই পদ্ধতিতেই সমাধান হবে।"

অতএব, আমাদের এমন একটি প্রজন্ম গড়ে তুলতে হবে, যারা যথাসম্ভব ধারণ করবে সাহাবায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্যাবলি। তাঁদের মধ্যে থাকবে সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণে ঈমানি দৃঢ়তা, আপসহীনতা ও মানবতার প্রতি মমতাবোধ। থাকবে হকের জন্য সর্বস্ব কুরবানির শিক্ষাসহ আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের সুদৃঢ় অঙ্গীকার। থাকবে শেষ রাতের আহাজারি।

শতাব্দীর এই ক্রান্তিলগ্নে যখন সকল মানবরচিত মতাদর্শ প্রত্যাখ্যাত, তখন এ পিপাসার্ত দুনিয়াকে সঞ্জীবনী সুধা দিতে ও নব আঙ্গিক সৃষ্টি করতে পৃথিবী অপেক্ষা করছে এমন একটি সুসংগঠিত জামায়াতের, যারা হবেন সাহাবীদের চরিত্রে ভূষিত। আর্তমানবতা

প্রতীক্ষার দিন গুনছে তাদের জন্য। তাদের আগমন যত দ্রুত হবে, পৃথিবীও তত দ্রুত একটি অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস থেকে বেঁচে যাবে। সমগ্র দুনিয়াব্যাপী তাদের আগমনের স্লোগান শোনা যাচ্ছে। চারিদিকে শত্রুরা সোনালি চরিত্রের মানুষদের বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে। তাদের উপর চলছে ইতিহাসের জঘন্যতম নির্যাতন। এত কিছুর পরও তারা বাধার হিমালয় ডিঙিয়ে এগিয়ে চলছে। এগিয়ে চলছে রক্তসাগরের উত্তাল ঢেউকে পেছনে ফেলে। এই কাফেলা মনজিলে মাকসুদপানে নিরন্তর এগিয়ে চলছে।

কতিপয় সাহাবাদের অনুপম জীবনচিত্র

সাহাবীদের সুমহান জীবনের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা নিয়ে আমরা যতটুকুই অধ্যায়ন করি, তা হয়তো খুবই অল্পবিস্তর। তাঁদের বৈপ্লবিক জীবনের এক আজলাও হয়তো এখানে বিম্বিত হয়নি। সাহাবারা তো এমন জীবন রচনা করে গেছেন, বক্ষ্যমাণ হাজার গ্রন্থেও তাঁদের জীবনের রোজনামচা তুলে ধরা অসম্ভব। আমরা তাঁদের জীবন থেকে কিছু অনুপম দৃষ্টান্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করি।

সাহাবীদের সংখ্যা লক্ষাধিক। তাঁদের প্রত্যেকের জীবন স্বমহিমায় ভাস্বর। একেকজনের জীবনেই রয়েছে অত্যুজ্জ্বল অনেক দৃষ্টান্ত। সাহাবীদের জীবন শুধু ভক্তি-শ্রদ্ধার পরিমণ্ডলে আর মর্যাদার পবিত্র আসনে সীমিত থাকার বিষয় নয়; বরং তাঁদের জীবনের বেলাভূমি থেকে আমাদের কুড়িয়ে নিতে হবে মূল্যবান মণিমানিক্য। আর তা দিয়ে সাজাতে হবে আমাদের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকেও। শুধু আমাদের প্রজন্মের জন্য নয়; বরং সাহাবায়ে কেরামের জীবনে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষের জন্যও রয়েছে জীবন চলার আলো। আর সে আলোর পথ ধরে যাওয়া যাবে চিরসবুজ জান্নাতে। এত এত সাহাবার মধ্য থেকে কতিপয় সাহাবাদের জীবনের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক নিয়ে আমরা এখন যাত্রা শুরু করব। জীবনের বিস্তৃত বেলাভূমি থেকে কিছু নুড়ি কুড়িয়ে চেষ্টা করি। সচেষ্ট হই তাঁদের সৌরভে মৌতাত বাগান থেকে কিছু ফুল সংগ্রহ করতে। তবে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব, তাঁদের প্রতিজনের জীবন থেকে একটি বিষয়ে দু-একটি দৃষ্টান্তের মধ্যেই। ইতিহাসের মোটা চাদরের ওপারে কিছু সময়ের জন্য সফর করে আসা যাক।

■ আবু বকর সিদ্দিক(رَضِيَ اللَّهُ عَنْه)

[ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠায় চির আপসহীন]

আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রধান সাহাবী। তিঁনি ইসলামের প্রথম খলিফা এবং প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। নবীয়ে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অগাধ বিশ্বাসের কারণে তাঁকে 'সিদ্দিক' তথা পরম বিশ্বাসী উপাধি প্রদান করা হয়(মিরাজের ঘটনার প্রেক্ষিতে)। সৎ ব্যবসায়ী হিসেবেও আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর খ্যাতি ছিল আকাশচুম্বী। ইয়েমেনের বাণিজ্য সফর থেকে ফিরে এসে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসলাম প্রচারের সংবাদ পেয়ে কোনো দ্বিধা ছাড়াই তাৎক্ষণিক ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্ক ছিল খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ। ইসলামপূর্ব যুগেও তাঁরা অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আর ইসলামের আগমনের পর তো সেই বন্ধুত্ব পরিণত হয় বিশ্বাসের এক শীলাদৃঢ় বন্ধনে।

আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অত্যন্ত কোমলপ্রাণ ও সদয় মানুষ। কিন্তু ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে তিনি ছিলেন সীমাহীন মজবুত। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন ইন্তেকাল করে রফিকে আ'লার কাছে চলে যান, সেদিনটি ছিল সাহাবায়ে কেরামের জীবনে সবচেয়ে কঠিন ও শোকার্ত দিন। সর্বগ্রাসী বিপর্যয় যেন সব কিছুকে ঢেকে দিলো। সমস্ত সাহাবী ছিলেন শোকে বিহ্বল ও দিশেহারা। প্রাণের প্রিয়জনকে হারিয়ে তাঁরা বেকারার। উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু তো মানতেই নারাজ যে, নবীয়ে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হয়েছে! উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু তরবারি হাতে নিয়ে ঘোষণা দিচ্ছিলেন- 'মুহাম্মাদ ﷺ ইন্তেকাল করেছেন–এই কথাটি যে বলবে, তাকে হত্যা করা হবে।' এমনি পরিস্থিতিতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লাশ মুবরাককে চুমো খেয়ে আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু কুরআনের আয়াতটি পড়লেন–

.. إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ﴿٣١﴾

“নিশ্চয় আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর কিয়ামত দিবসে তোমরা পরস্পর তোমাদের রবের সামনে বাকবিতণ্ডা করবে।” [সূরা যুমার: ৩০-৩১]

অতপরঃ আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে নববীর মিম্বারে দাঁড়ালেন। সমস্ত সাহাবীর উদ্দেশ্যে সেদিন তিঁনি যে বক্তব্য রেখেছেন, তা ইসলামের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচ্ছেদে আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর হৃদয়

সবচেয়ে বেশি আহত ছিল। কিন্তু সমস্ত বেদনার আগ্নেয়গিরি বুকে চেপে রেখে তিঁনি বললেন–

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓي اَعْقَابِكُمْ ۗ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰي عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللهُ الشّٰكِرِيْنَ

“মুহাম্মাদ কেবলই একজন রাসূল। তাঁর পূর্বেও অনেক রাসূল গত হয়েছেন। তিঁনি যদি ইন্তেকাল করেন অথবা নিহত হন, তবে কি তোমরা দ্বীন থেকে সরে দাঁড়াবে? আর যে ব্যক্তি (আল্লাহর দ্বীন) পেছনে ফিরে যায়, সে কখনও আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারে না (বরং সে নিজেরই ক্ষতি করে)। আল্লাহ অচিরেই শোকরগুজার বান্দাদের প্রতিদান দেবেন।” [সূরা আলে ইমরান: ১৪৪]

আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর এ বক্তব্যের পর শোকার্ত সাহাবীদের অস্থিরতা প্রশমিত হল। অগ্নিশর্মা উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর তরবারি হাত থেকে খসে পড়ে। আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর হাত চুম্বন করে উমার বললেন– ‘কুরআনের এ আয়াত আমার স্মৃতি থেকে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছে আপনার উপর আল্লাহর সিদ্ধান্ত অবতীর্ণ হয়েছে।’ নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায়ের পর আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু খিলাফতের দায়িত্ব পেলেন। তাকওয়া ও দূরদর্শিতার কারণে নির্বাচিত হলেন ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রায় বিশ হাজারেরও বেশিসংখ্যক সাহাবীর উপস্থিতিতে সিদ্দিকে আকবর, খলিফাতুর রাসূল(ﷺ) আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রথম রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। খলিফাতুল মুসলিমিন আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রদত্ত এ বক্তব্য সকল যুগের রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য এক অমূল্য সম্পদ।

মসজিদে নববীর ফাঁকা মিম্বারে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধিত্ব করতে দাঁড়ালেন আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

খলিফা হিসেবে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন—

"হে মানবসকল! আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে খলিফা নির্বাচন করা হয়েছে। অথচ আমি আপনাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি নই। আল্লাহর কসম! আমি চেয়েছিলাম আপনাদের মধ্যে অন্য কেউ এ দায়িত্ব গ্রহণ করুক। আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আপনারা যদি প্রত্যাশা করেন আমার আচরণ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো হোক, তাহলে আমাকে সে মানে পৌঁছার ক্ষেত্রে অক্ষম পাবেন। তিঁনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল ও মাসুম। কিন্তু আমার বিশেষ কোনো মর্যাদা নেই। আমি আপনাদের মতো একজন সাধারণ মানুষ। আমি ভালো কাজ করলে আমাকে সাহায্য করবেন আর ভুল করলে আমাকে সংশোধন করে দেবেন। মনে রাখবেন, সততা হচ্ছে একটি আমানত আর মিথ্যা একটি খেয়ানত। আল্লাহর কসম! আপনাদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তি আমার কাছে সবচেয়ে সবল বলে

বিবেচিত হবে, যতক্ষণ না আমি তার ন্যায্য অধিকার তাকে আদায় করে দিতে পারি। আর আপনাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি আমার কাছে সবচেয়ে দুর্বল বলে বিবেচিত হবে, যতক্ষণ না অন্যের অধিকার আমি তার থেকে ছিনিয়ে নিতে পারি।
হে লোকসকল! জিহাদকে অবহেলা করা যাবে না। আল্লাহর পথে জিহাদ থেকে যে জাতি বিরত থাকে, তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হবে। আর যখন কোনো জাতির মধ্যে পাপাচার ব্যাপক রূপ ধারণ করে, তখন সে জাতির উপর আল্লাহর গজব অবতীর্ণ হয়।
হে আমার ভাইগণ! যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করব, ততক্ষণ আপনারাও আমার নির্দেশ পালন করবেন। আর যদি আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে পরিহার করি, তবে আমার আদেশ পালন আপনাদের উপর আর জরুরি নয়।"

প্রথম খলিফা আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর এ ভাষণ সকল রাষ্ট্রনায়ক ও দায়িত্বশীলদের জন্য এক যুগান্তকারী দলিল।

আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরে প্রথম যে উদ্যোগটা তিনি নিয়েছিলেন সেটা ছিলো উসামা বিন যায়েদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বাহিনীকে নির্ধারিত জিহাদে পাঠানো। এই বাহিনীকে রোমানদের সাথে যুদ্ধের জন্য রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্তুত করেছিলেন (সেই বাহিনীটা রওনাও দেয় কিন্তু রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থতা বৃদ্ধির খবর শুনে তারা এগোয়নি এবং এর মাঝেই রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেন)। আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ক্ষমতায় এসে প্রথমেই উদ্যোগ নিলেন এই বাহিনীকে পুনরায় প্রেরনের জন্য। তবে সার্বিক বিপর্যয় বিবেচনা করে এ অভিযান চালানো সে সময় ঠিক হবে কি না, এ নিয়ে আলাপ উঠে। আর অভিযান চালানো ঠিক হলেও সতেরো বছর বয়সি উসামা ইবনে যায়েদ(রদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে সেনাপতির পদে বহাল রাখা ঠিক হবে কি না এ নিয়েও উঠে বিতর্কের ঝড়। বাহিনী পুনর্গঠনের পরামর্শ দেন বা আপাতত অভিযান স্থগিত রাখার আবার যদি সৈন্য পাঠাতেই হয়, তবে যেন সেনাপতি পরিবর্তন করা হয় এমনও পরামর্শ দেন অনেকে। এ কথা শুনে আবু বকর সিদ্দিক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন– "আমি কি ওই ব্যক্তির হাত থেকে নেতৃত্বের ঝাণ্ডা কেড়ে নেব, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার হাতে ঝান্ডা তুলে দিয়েছেন?"
আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর এমন কথা শুনে সকলে নীরব হয়ে গেলেন। শেষে উসামা ইবনে যায়েদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বাহিনী রওনা হলো শামের দিকে। মাত্র ৪০ দিনের মাথায় উসামা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর বাহিনী সফল অভিযান পরিচালনা করে মদিনায়

ফিরে আসে।
সুবহানাল্লাহ! রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্ত ও তাঁর নিয়োগকৃত কিশোর সেনাপতির প্রতি আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর শ্রদ্ধাবোধ ও আপসহীনতা সমস্ত উম্মতের জন্য এক বিরল দৃষ্টান্ত।

আবু বকর ররদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর খিলাফতের শুরুতে নানা সমস্যা একসাথে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের বিরাট শুন্যতাকে পুঁজি করে সাম্রাজ্যবাদী রোমান ও পারস্য আবার ফণা বিস্তার করে। এদিকে নিজেদের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকা মুনাফিকেরাও সৃষ্টি করে হাজারো সমস্যা। সে সময় নবুওয়তের মিথ্যা দাবিদার গোষ্ঠী প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে জেগে ওঠে।
আ'য়িশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা মন্তব্য করেন–"খিলাফতের প্রথম অবস্থায় আমার আব্বার উপর সমস্যার প্রচণ্ড তুফান বয়ে যাচ্ছিল–যা এতই ভারি ছিল যে, তা যদি কোনো পাহাড়ের উপর রাখা হতো, তবে পাহাড় জমিনের সাথে মিশে যেত।"

আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর খিলাফতের সূচনাতে বনু আবাস ও জুবইয়ান ইত্যাদি শক্তিশালী গোত্রসমূহ একযোগে ঘোষণা করল–তারা ইসলামের সব অনুশাসন মেনে চলবে, তবে বায়তুলমালে যাকাত দেবে না। একসাথে এতগুলো প্রভাবশালী গোত্রের বিদ্রোহ মুসলিমদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে। আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু জরুরি মজলিসে শুরার অধিবেশন আহ্বান করেন। অনেকেই খলিফাকে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকতে বলেন। অধিবেশনে আরও বলা হয়–বায়তুলমালে যাকাত না দেওয়ার ঘোষণাকে যেন মেনে নেওয়া হয়। বিদ্রোহীদের সাথে সমঝোতা করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু। কিন্তু আবু বকর সিদ্দিক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এসব প্রস্তাবকে এ কথা বলে প্রত্যাখ্যান করেন–
... وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِه .
“আল্লাহর শপথ! যারা সালাত ও যাকাতকে আলাদা করবে, আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব। সম্পদের হক হলো যাকাত। আল্লাহর শপথ! যদি তারা আমাকে একটি রশি দিতেও অস্বীকৃতি জানায়-যা তারা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দিত, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।” [আবু দাউদ: ১৫৫৬]

খলিফার এ দৃঢ় ঘোষণার পর কেউ ভিন্নমত পোষণ করার সাহস করেননি। অতঃপর

বায়তুলমালে যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালিত হলো। পরিশেষে তাদেরকে বায়তুলমালে যাকাত দিতে বাধ্য করা হলো। ঐতিহাসিকগণ বলেন, সেদিন আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু যদি এই কঠিন সিদ্ধান্ত না নিতেন, তবে ইসলামের এ বিধান আজ পর্যন্ত টিকে থাকত কি না সন্দেহ। এ প্রসঙ্গে উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন–

...فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ... فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .

“আল্লাহর শপথ! আমি বুঝতে পারলাম যে, মহান আল্লাহ আবু বকরের হৃদয়কে যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আমি এও বুঝতে পারলাম যে, এই পদক্ষেপই সঠিক ছিল।” [আবু দাউদ: ১৫৫৬]

মুসলিম উম্মাহ আজ জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে কুফরের সাথে, প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে, আপাত প্রয়োজনের কারণে কিংবা ভয়ভীতির কারণে আপস করে চলছে। আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অনুশীলন ও অনুসরণের পরিবর্তে ইসলামকে বাধ্য করা হচ্ছে বাতিলের সাথে আপস করে চলতে। হায়! মুসলিমরা আজ ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণ না করে বাতিলের সাথে কিছু দানাপানি আর স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনের জন্য আপস করে চলছে।

এক্ষেত্রে আবু বকর সিদ্দিক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু যে দৃঢ়তা ও আপসহীন মানসিকতা প্রদর্শন করেছেন, তা সমস্ত উম্মাহর জন্য অনুসরণীয়। আজ পতন যুগের এ মুসলিম উম্মাহকে সর্বগ্রাসী ধ্বংস ও বিকৃতি থেকে মুক্ত করতে হলে ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর দৃঢ়তা ও আপসহীনতার কোনো বিকল্প নেই।

■ উমার ইবনে খাত্তাব (رَضِيَ اللَّهُ عَنْه) ■

[আল্লাহর ভয়ে এক প্রকম্পিত হৃদয়]

ইসলামের ইতিহাসে যার নাম উজ্জ্বল দীপ্তি ছড়াচ্ছে, যে নাম উচ্চারিত হলে মনের অলিন্দে গভীর এক শ্রদ্ধার অনুরণন জাগে, বারোয়ারি এ জীবনে অনন্য ঈমানের হিন্দোলে জেগে ওঠে খরখরে রুক্ষ মন, ইসলামের দিগন্তকে প্রসারিত করার ক্ষেত্রে যার সাথে কারও তুলনা নেই, সেই নাম হলো উমার ইবনে খাত্তাব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু। তিঁনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। যাঁর নামেই সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয় 'আমিরুল মুমিনিন' মর্যাদার এ সম্ভাষণ বাক্য। ইসলাম গ্রহণের পর উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর তাক্বওয়া ও দ্বীনের প্রতি অবিচলতা দেখে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ .
"আমার পরে কেউ যদি নবী হতো, তবে অবশ্যই উমার ইবনুল খাত্তাবই নবী হতো।" [তিরমিযি: ৩৬৮৬]

এই উমার সেই উমার, যিঁনি কি না মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন! পথিমধ্যে বন্ধু নাঈম ইবনে আবদুল্লাহর কাছে বোন ফতিমা আর ভগ্নিপতি সাঈদের ইসলাম গ্রহণের খবর পেয়ে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তাঁদের বাড়ি যান। তিনি দেখলেন, তাঁরা কুরআন শিখছে। এই কুরআনের সুর উমারের মনোজগৎ পরিবর্তন করে দিলো। উমার নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গিয়ে সমর্পণ করলেন নিজেকে। আবেদন করলেন–'ইয়া রাসূলাল্লাহ, কালিমার সঞ্জীবনী সুধা আমায় পান করান।'

উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ইসলাম গ্রহণ ছিল ইসলামের জন্য প্রাথমিক বিজয়। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন–
مَا كُنَّا نَقْدِرُ عَلَى أَنْ نُصَلِّيَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ حَتَّى أَسْلَمَ عُمَرُ فَلَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ قَاتَلَ قُرَيْشًا، حَتَّ صَلَّى عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ.
"উমার ইসলাম গ্রহণের আগপর্যন্ত আমরা কাবাগৃহে নামাজ আদায়ে সক্ষম হইনি। তিঁনি ইসলাম গ্রহণের পর কুরাইশদের সাথে লড়াই করেন ও কাবায় নামাজ আদায় করেন। আর আমরাও তাঁর সাথে নামাজ আদায় করি।" [ইবনু হিশাম ১/৩৪২]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু আরও বলেন–
مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ .
"যেদিন উমার ইসলাম গ্রহণ করেন, সেদিন থেকে আমরা মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করেছি।" [বুখারি: ৩৪১৯]
উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু যখন শুনলেন, তিঁনি পরবর্তী খলিফা হতে যাচ্ছেন, তখন তিঁনি বলে উঠলেন-'আমি খাত্তাবের পুত্র উমার, আমি পাহাড়ে মেষ চরিয়ে বেড়িয়েছি, কী করে আমি খলিফা হই!' খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি উমার জানিয়ে দিয়েছেন-'আমি খিলাফত চাই না।' আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বলেন-'হে উমার, তুমি খিলাফত চাও না, কিন্তু খিলাফত তোমাকে চায়।'
মুসলিম হওয়ার পর উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর রুক্ষ জীবনে আমূল পরিবর্তন এসেছিল। তাঁর পুরো জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ড উম্মতের জন্য হয়ে উঠে পাথেয় এবং দৃষ্টান্তের এক অখণ্ড সমষ্টি।

উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর আল্লাহভীতি ছিল সবচেয়ে প্রকট। কোন তাক্বওয়ার মানদণ্ডে যে আমরা উমারের তাক্বওয়া পরিমাপ করবো এ দৃষ্টতা আমাদের নেই। আল্লাহ তা'আলার ভয়ে উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এতই ক্রন্দন করতেন যে, চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত, মাঝে মাঝে তিঁনি হুঁশ হারিয়ে ফেলতেন। তাঁর অতিরিক্ত কান্নার কারণে গণ্ডদেশে দুটি কালো দাগ পড়ে গিয়েছিল।

অন্ধকার রাতে জনগণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য তিঁনি মদিনার অলিতে-গলিতে হাঁটতেন আর বলতেন- 'হে মদিনার অধিবাসীগণ! তোমরা আরামে ঘুমাচ্ছ অথচ আমাকে ঘুমাতে দিচ্ছ না।' খিলাফতের দায়িত্ব সাইয়্যিদুনা উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে অস্থির করে রাখত। খিলাফতের দায়িত্বকালীন সময়ে তিনি রাতে ঘরে তেমন একটা ঘুমাতেন না। প্রায় দিনের বেলায় মসজিদে নববীতে ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে যেতেন অর্ধ জাহানের খলিফা।

মুসলিমরা জেরুসালেম নগরী অবরোধ করে রেখেছেন। সেনাপতি আমর ইবনুল আস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নেতৃত্বে মাসের পর মাস চলছে অবরোধ। অবশেষে খ্রিষ্টান নেতৃবৃন্দ জানালেন, খলিফা উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু যদি জেরুসালেম নগরীতে আসেন, তাঁর উপস্থিতিতেই বিনা রক্তপাতে এ পবিত্র নগরীর চাবি তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হবে।

আমিরুল মুমিনি এই সংবাদ পেয়ে জেরুসালেম রওনা হলেন। অসংখ্য নবি-রাসূলের স্মৃতিবিজড়িত জেরুসালেমের দিকে পথ চলছেন উমার ইবনুল খাত্তাব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু। অর্ধ পৃথিবীর শাসক চলেছেন সূদুর জেরুসালেমের উদ্দেশে। সঙ্গে একজন গোলাম। সামান্য খাবার ও পানি নিয়ে উটের পিঠে আরোহী হয়ে তিনি নেমে পড়েছেন জেরুসালেমের পথে। খরতপ্ত মরু উটের লাগাম হাতে চলছে গোলাম। ঘাম ঝরছে দরদর করে। সমগ্র পৃথিবী যে উমারের ভয়ে কম্পমান, সে উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর ভয়ে কাঁপছেন তখন। গোলামকে ডেকে বললেন-'আসলাম! তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, আমাকে কিছুক্ষণ উটের রশি হাতে চলতে দাও। আর তুমি উটের পিঠে বস।' আসলাম বললেন-'অসম্ভব, এটা কখনও হতে পারে না।' খলিফা বললেন-'না, সারাপথে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে তুমি উট টেনে চলবে, এটাও হতে পারে না। আমি এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করছি।'

খলিফা নির্দেশ দিয়ে গোলামকে উটের পিঠে চড়িয়ে তিনি উটের রশি হাতে মরু পাড়ি দিতে লাগলেন। এইভাবে পালাক্রমে দিনের পর দিন অতিক্রম করে জেরুসালেম নগরীর প্রান্তে উপস্থিত হলেন তাঁরা। খ্রিষ্টান পাদরিগণ বিশ্বনন্দিত রাষ্ট্রনায়ককে অভিবাদন জানানোর জন্য এগিয়ে গেলেন, যার জন্য এতদিন অপেক্ষা করছেন।

অভিবাদন জানাতে আসা পাদ্রিদের চোখ কপালে উঠে গেল এজন্য যে, জৌলুসহীন একটি উটের ওপর আরোহী হয়ে এসেছেন প্রতাপশালী শাসক উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু। নেই কোনো লোকলস্কর কিংবা রাজকীয় সাজসরঞ্জাম। বিস্ময় চেপে তারা এগিয়ে গেলেন এই উটের আরোহী খলিফাকে শ্রদ্ধা জানাতে। কিন্তু হায়! তাদের জন্য যে আরও নিদারুণ বিস্ময় অপেক্ষা করছে, তা কে জানত! পালাক্রমে উটে আরোহণ করতে করতে পথ চলছিলেন খলিফা এবং খলিফার সফরসঙ্গী গোলাম। যখন পথের শেষ হয়ে তারা জেরুসালেমের দারপ্রান্তে পৌঁছেছেন, তখন চলছিল গোলামের উটে আরোহণের পালা। পাদ্রিরা যখন খলিফাকে অভিবাদন জানাতে উটের আরোহীর দিকে এগিয়ে গেলেন, তখন খলিফার গোলাম বললেন-'আমি খলিফা নই! উটের রশি যিনি ধরে আছেন তিঁনিই খলিফা।'

খ্রিষ্টান সেনাপতি, নরপতি ও হাজার হাজার কৌতূহলী জনতা এ দৃশ্য দেখে হতবাক। মানব ইতিহাসে এমন দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আজ যখন বর্ণ, ধর্ম, প্রথা ও ভাষার বিভক্তিতে মানবতা খণ্ডিত, বিভাজিত, অবহেলিত, উপেক্ষিত ও পদদলিত। এমন সময় উমরের মানবতাবাদী আদর্শ মানুষের জন্য নিয়ে এসেছে ধুলোধূসরিত গোলামকে মানবতার উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত করার বিজয়বার্তা। উটের রশি হাতে উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর উপস্থিতি খ্রিষ্টান জনপদকে এত অভিভূত ও বিস্মিত করেছিল যে, তাদের যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ করার সমরাস্ত্র, তীর, বল্লম, উন্মুক্ত কৃপাণ সবকিছু উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর মানবতার কাছে পরাভূত ও পরাজিত হয়েছে। বিনা যুদ্ধে, বিনা বাক্যব্যয়ে পবিত্র জেরুসালেম নগরীর চাবি তারা তুলে দেয় খলিফা উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাতে।

আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে জিন্দেগি অতিবাহিত করার মধ্যে রয়েছে সমস্ত কল্যাণের চাবিকাঠি। এই খোদাভীতি হচ্ছে জীবনতরীর নোঙর। আমিরুল মুমিনিন উমার ফারুক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর তাক্বওয়া ভিত্তিক শাসন পরিচালনা পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত এক জ্বলন্ত ও অনুপম দৃষ্টান্ত।

- **উসমান ইবনে আফফান (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)**

  [ধৈর্য ও উদারতার মূর্তপ্রতীক]

উসমান ইবনে আফফান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা। তিঁনি প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই মেয়েকে

বিয়ে করার কারণে উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে 'যুন নুরাইন' বা দুই জ্যোতির অধিকারী নামেও সম্বোধন করা হতো। নবীকন্যা রুকাইয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। হিজরি দ্বিতীয় সনে বদর যুদ্ধের পরপর রুকাইয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহা ইন্তেকাল করেন। এরপর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দ্বিতীয় কন্যা উম্মে কুলসুমের সাথে উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বিয়ে দেন।

উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন বেশ নামকরা ব্যবসায়ী। তাঁর ধনাঢ্যতাও ছিল প্রসিদ্ধ। এ কারণে তাঁর নামের শেষে 'গনি' কুনিয়াত যুক্ত হয়। গনি শব্দের অর্থ হলো ধনশালী। সম্পদশালী হওয়ার কারণে যেমন তিঁনি বিখ্যাত ছিলেন, তেমনি দানশীলতার জন্যও ছিলেন মশহুর।

উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর লাজুকতা, উদারতা ও দানশীলতা ছিল অতুল্য। তাঁকে রাসূল সা. কতখানি ভালোবাসতেন, তাঁর নিকট পরপর দুই কন্যাকে বিয়ে দেওয়ার মাধ্যমেই তা অনুমিত হয়। উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত ভালোবাসতেন যে, তিঁনি তাঁর হাতকে উসমানের হাত আখ্যায়িত করেন। হুদায়বিয়াতে অনুষ্ঠিত বাই'আতের আগে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে কুরাইশদের সাথে মধ্যস্থতা করার জন্য মক্কায় পাঠান। বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তখন ইতিহাসবিখ্যাত 'বাইয়াতুর রিদওয়ান' অনুষ্ঠিত হয়। তখন সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে হাত রেখে বাইয়াতবদ্ধ হন। সে সময় নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুপস্থিত উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বাইয়াতও নিজের প্রতিনিধিত্বে গ্রহণ করেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন ডান হাতের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন–

هٰذِهِ يَدُ عُثْمَانَ، فَضَرَبَ بِهَا عَلٰى يَدِهِ وَقَالَ : هٰذِهِ لِعُثْمَانَ ...

"এটা উসমানের হাত। তারপর তিনি সে হাতটি নিজের অপর হাতের ওপর রেখে বললেন- এটা উসমান-এর বাইয়াত।" [বুখারি : ৩৪৩৩]

ইসলামের জন্য উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বিপুল ধনসম্পদ অকাতরে ব্যয়িত হয়েছে। ইসলামের প্রয়োজনে যখন যা দরকার হয়েছে, উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু তখন তা দিয়ে সহযোগী হয়েছেন।

মুহাজির মুসলিমদের আগমনের পর আকস্মিকভাবে মদিনায় জনসংখ্যা বেড়ে যায়। ফলে

বাসস্থান, খাদ্যসহ সবদিকেই চাপ পড়ে। বিশেষ করে দেখা দেয় সুপেয় পানির সংকট। এতদিন আওস ও খাযরাজের যে পানির জোগান ছিল, তা মুহাজিরদের সাথেও ভাগাভাগি করতে হওয়ায় খাবারপানি নিয়ে কষ্টে পড়তে হয় সকলকে।

মদিনায় রুমা নামক কূপটি ছিল সুপেয় পানির জন্য বেশ প্রসিদ্ধ। কিন্তু সেটির মালিকানা ছিল এক ইহুদির। পানি নিয়ে সংকট শুরু হওয়ার সুযোগে ইহুদি লোকটি চড়া মূল্যে পানি বিক্রি শুরু করে। এতে গরিব মুহাজির মুসলিমদের কষ্টের অন্ত রইল না। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি সংকট ও ইহুদি ব্যক্তিটির কারসাজি জানতে পেরে ঘোষণা দিলেন-'তোমাদের মধ্যে কি কেউ নেই, যে এ কূপ কিনে মুসলিমদের জন্য ওয়াকফ করে দেবে? এ কাজ যে করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে একটি ঝরনার মালিকানা দেবেন।'

নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন ঘোষণা শুনে উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইহুদি লোকটির কাছে কূপ বিক্রির প্রস্তাব দেন। কিন্তু সে কৌশলে কূপটি বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানাল। অতঃপর উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু অর্ধেক কূপ বিক্রির প্রস্তাব করলেন; এভাবে যে-কূপ থেকে একদিন ইহুদি পানি নেবে, অন্যদিন তিনি। ইহুদি এতে সম্মত হলো। এদিকে উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু কূপ কেনার পর বিনামূল্যে পানি বিতরণ শুরু করেন, এতে ইহুদির পানির ব্যাবসা বন্ধ হলো এবং একপর্যায়ে সে পুরো কূপ বিক্রি করে দিলো। ৩৫ হাজার দিরহামের বিনিময়ে উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু পুরো কূপের মালিকানা লাভ করেন এবং তা সকলেন জন্য ওয়াকফ করে দেন। সে কূপের আওতাধীন কিছু খেজুরগাছ ছিল-যা পরে বিশাল বাগানে পরিণত হয়েছে। সে খেজুর বাগান থেকে যে অর্থ জমা হতো, তা আবার অনাথ ও অসহায়দের জন্য ব্যয় করা হতো। এমনই দৃষ্টান্তমূলক ছিল উসমানের দানশীলতা।

আবু বকর সিদ্দিক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর খিলাফতের যুগে দেশে একবার খাদ্যাভাব দেখা দিলে মুসলিমরা অনাহারে দিনতিপাত করেছিল। খলিফা আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সাহায্য চাইলেন। সে সময় উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর মালিকানাধীন উটের একটি বিরাট কাফেলা মিশর থেকে খাদ্যসামগ্রী বোঝাই করে মদিনায় এসে পৌঁছেছে। উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু খাদ্যসামগ্রীসহ বিশালসংখ্যক উটের এ পুরো কাফেলাই বায়তুলমালে দান করে দেন। বদান্যতার কী অসাধারণ দৃষ্টান্ত!

একদিন যিনি ক্ষুধার্তদের মুখে খাবার তুলে দিয়েছিলেন, পরবর্তী সময়ে সেই উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর পরিবারকে দিনের পর দিন অভুক্ত রেখে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় শহিদ করেছে পাপিষ্ঠরা।

মিশরের রাজনীতির কারণেই মূলত উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বিরুদ্ধে নানান বানোয়াট অভিযোগ সামনে এনে বিদ্রোহী গোষ্ঠী তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করে। কিন্তু উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া উপদেশ শেষ পর্যন্ত পালন করেন।

মিশর, বসরা ও কুফার বিদ্রোহী গোষ্ঠী একাট্টা হয়ে ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় সমবেত হয়ে খলিফার পদত্যাগ দাবি করে। হজ উপলক্ষ্যে অধিকাংশ মদিনাবাসী মক্কা গমন করায় তারা এ সময়কেই মোক্ষম সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। খলিফা পদত্যাগে অস্বীকৃতি জানালে তারা হত্যার হুমকি দিয়ে তাঁকে অবরুদ্ধ করে রাখে। উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু মুসলিমদের রক্তপাতের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। বিশাল মুসলিম জাহানের খলিফা হিসেবে মুষ্টিমেয় বিদ্রোহীকে কঠোর শাস্তিদানের পরিবর্তে তিঁনি তাদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে থাকলেন।

উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সবরের মূর্তপ্রতীক। ধৈর্য ও সবরের পরম দৃষ্টান্ত রয়েছে তাঁর অন্তিম সময়ের কথামালাতে। তখন ক্রমেই বিদ্রোহীদের উত্তেজনাকর কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু খলিফার সামনে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন- হে রাসুলের খলিফা। আপনার ঘরের সামনে ৭০০ মুজাহিদ তরবারি হাতে দণ্ডায়মান। আপনি নির্দেশ দিন, আমরা বিদ্রোহীদের সাথে লড়াই করতে চাই।' ধৈর্যের প্রতিমূর্তি উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু সেই কঠিন সময়ে বললেন-'আমি মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিতে পারব না। আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খলিফা হয়ে নিজের জন্য মুসলিমদের রক্ত প্রবাহিত করতে দেবো না।' উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু অনুরূপ জবাব দিলেন আনসার নেতা যায়েদ ইবনে সাদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কেও। যায়েদ ইবনে সাদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু যখন লড়াইয়ের অনুমতি চাইলেন, তখন উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন- 'না, আমার জন্য কেউ তরবারি কোষমুক্ত করতে পারবে না। এ অবস্থায় এটাই হবে তোমাদের পক্ষ থেকে আমার প্রতি সবচেয়ে বড়ো সহযোগিতা।'

দিনটি ছিল জুম'আ বার। খলিফা উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন রোজাদার। ভোরে তিঁনি

স্বপ্ন দেখলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর ও উমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা কে সাথে নিয়ে উসমানকে ডেকে বলছেন- 'উসমান! শীঘ্রই চলে এসো, আমি তোমার সাথে ইফতারের অপেক্ষায় আছি।' ঘুম থেকে উঠে খলিফা স্ত্রীকে বললেন-'আমার শাহাদাত আসন্ন। বিদ্রোহীরা আজই আমাকে হত্যা করবে।' তিঁনি নতুন জামা ও পাজামা পরিধান করলেন। কুরআন হাতে নিলেন। যে কুরআনের সাথে ছিল তাঁর সারা জীবনের নিবিড় সম্পর্ক। তিঁনি ছিলেন হাফিজুল কুরআন ও জামি'উল কুরআন (কুরআন সংকলনকারী)। তিলাওয়াতে মশগুল হলেন খলিফাতুল মুসলিমিন উসমান ইবনে আফফান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু। তিঁনি যেন শাহাদাতের আবে হায়াত পান করার প্রস্তুতি নিলেন সাগ্রহে।

এদিকে আলী, তালহা ও যুবাইর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা এর ছেলেদের দ্বারা গঠিত ১৮ জন নিরাপত্তারক্ষী বিপথগামী বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করতে থাকেন। কিন্তু একপর্যায়ে বিদ্রোহীরা তাঁদের উপর প্রবল হয়ে ওঠে। অবশেষে বিদ্রোহীরা আসরের নামাজের পর ৮২ বছর বয়স্ক বৃদ্ধ খলিফাকে অত্যন্ত বর্বরোচিতভাবে পবিত্র কুরআন পাঠরত অবস্থায় শহিদ করে।

তিন দিন পর্যন্ত বিদ্রোহীরা উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর লাশ ঘর থেকে বের করতে দেয়নি। আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু তখন বাহুবলে বিদ্রোহীদের সরিয়ে তাঁর লাশ নিয়ে গভীর রাতে জানাযা শেষে জান্নাতুল বাকির কবরস্থানে দাফন করেন। মাত্র ৭০ জন মানুষ এ জানাযায় অংশ নেন। এমনকি বিদ্রোহীদের জন্য দাফনকার্যের সময় তাঁরা কোনো আওয়াজও করেননি। এ অন্ধকার রাতে চারদিক নীরব, নিস্তব্ধ। নীরবেই চলে গেলেন দুই জ্যোতির অধিকারী, মহান খলিফা উসমান ইবনে আফফান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

- **আলী ইবনে আবু তালিব (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ)**

[সাদাসিধা জীবনযাপনকারী খলিফা]

আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু কিশোরদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবি। তিঁনি আহলুল বাইত তথা নবীপরিবারের অন্যতম সদস্য। তাঁর পিতা কুরাইশদের বনু হাশিমের নেতা আবু তালিব। তিনি সেই আবু তালিব, যিনি নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হিসেবে ইতিহাসবিখ্যাত। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে নানা কারণে অত্যধিক স্নেহ করতেন। এর উল্লেযোগ্য একটি কারণ ছিল-নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে আলীর প্রতিপালিত হওয়া। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সর্বপ্রথম নামাজ আদায় করেন খাদিজা ও আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা।

নবুওয়তি জীবনের প্রথমদিকে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন স্বজনদের মজলিস আহ্বান করে ইসলামের দাওয়াত দেন, তখন একমাত্র কিশোর আলীই সাহসিকতার সাথে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমর্থনের ঘোষণা দেন। হিজরতের রাতে চরম সংকটাপন্ন মুহূর্তে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে তাঁর বিছানায় তাঁরই চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমান আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু। সেদিনই কুরাইশ যুবকদের সম্মিলিত তরবারির আঘাতে শত টুকরো হয়ে যেতে পারত তরুণ উঁনার শরীর। কিন্তু সেই শঙ্কা উপেক্ষা করে তিঁনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সহযোগী হয়েছেন।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ইসলামের প্রতিটি যুদ্ধে বীরত্বের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু। বদর যুদ্ধে বিশেষ বীরত্বের জন্য রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উপহার দেন 'জুলফিকার' নামক তরবারি।

খাইবারে ইহুদিদের সুরক্ষিত কামুস দুর্গের ফটক একাই উপড়ে ফেলেন আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু; অথচ পূর্বে আরও অনেক বীর সাহাবি সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করেও তা পারেননি। অসামান্য বীরত্বের জন্য রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে 'আসাদুল্লাহ' বা আল্লাহর সিংহ উপাধিতে ভূষিত করেন।

আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বাল্যকাল থেকেই নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরাপত্তায় কাজ করছিলেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তিঁনি আঠার মতো লেগে থাকতেন। আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবীয়ে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নিজেকে এমনভাবে জড়িয়ে নিয়েছিলেন যে, তিঁনি বলতেন- "আমি নবীজির সাথে সাথে এমনভাবে চলতাম, যেভাবে উটের বাচ্চা তার মায়ের সাথে চলাচল করে।"

ইলমের দিক থেকে আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর অবস্থান অনন্য। জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল। সাহিত্য, কাব্য, ব্যাকরণ, নীতিশাস্ত্র, দর্শন, নববি পাঠশালার জ্ঞান অথবা আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত নিগূঢ় প্রজ্ঞা-সব ক্ষেত্রেই আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর জানাশোনার গভীরতা ছিল উপমাহীন। তাঁর রচিত কাব্যসংকলন দিওয়ানু আলী আরবি সাহিত্যের এক অমূল্য রত্ন। আরবি ভাষার আজ যে কাওয়ায়েদ তথা ব্যাকরণের সম্মিলন আমরা দেখি, তার অগ্রদূত হচ্ছেন এই মহান সাহাবী। আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু -এর

তত্ত্বাবধানে আবুল আসওয়াদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রথম আরবি ব্যাকরণ রচনা করেন।

আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও নবীকন্যা ফাতিমা রদ্বিয়াল্লাহু আনহার বিয়ে হয় মাদানি জীবনের প্রথম দিকে। দেনমোহর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দেন উঁনার কাছে তেমন কিছুই নেই একখানা বর্ম ছাড়া। বর্মটি উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ৪৭০ দিরহাম দিয়ে কিনে নেন। তা থেকে সত্তর দিরহাম বিয়ের খরচের জন্য আর বাকি ৪০০ দিরহাম ধার্য হয় বিয়ের দেনমোহর। মসজিদে নববিতে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিয়ে সম্পন্ন হয় এবং উপস্থিত লোকদের খেজুর দ্বারা আপ্যায়ন করা হয়। মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বিয়ের খুতবা পাঠ করেন।
এই ছিল ইসলামের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান, অকুতোভয় বীর ও রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতার সরলতর ও অনাড়ম্বর জীবন। আজ জৌলুস, আরামপ্রিয়তা, পরিশ্রমবিমুখতা ও ভোগবিলাস মুসলিম উম্মাহর পরাজয় ও ধ্বংস নিয়ে এসেছে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের জীবন ছিল অতি সাধারণ ও অনাড়ম্বর। আর বিশেষত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর জীবন তো ছিল জৌলুসহীনতার অনন্য প্রতিচ্ছবি। আলীর জীবন থেকে জীবিকার অভাব-অনটন কোনোদিন বিদূরিত হয়নি।

আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও ফাতিমা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর সংসারের অভাবের সেই প্রতিচ্ছবি ইতিহাসের কোলে অনন্তকালের জন্য ঠাঁই করে নিয়েছে। ফাতিমা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে আদরের কন্যা। কিন্তু সেই আদরের কন্যার সংসারে ছিল খাবারের অভাব, আসবাবের অভাব, পরিধেয় বস্ত্রের অভাব। তবে আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ছিল শ্রেষ্ঠতম সম্পদ–ইলম, প্রজ্ঞা, বীরত্ব আর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপরিসীম আনুগত্য।

আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী, দুঃসাহসী, শক্তিশালী, ন্যায়বিচারক। তাঁর প্রতিটি কথা ছিল হিকমতপূর্ণ। দুনিয়ার প্রতি ছিল তাঁর অনাসক্তি। তিঁনি ছিলেন পরকালের প্রতি চিন্তামগ্ন, সাদাসিধা পোশাক পরিধানকারী, মানবতার অকৃত্রিম বন্ধু, ন্যায়ের সমর্থক ও অন্যায়ের ঘোর বিরোধী। এসব ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

আজকের বিলাসিতা ও জীবনের মান বৃদ্ধির প্রতিযোগিতার মাঠে আমরা বৈধ ও অবৈধতার সীমা লঙ্ঘন করে চলছি। 'আরও চাই', 'আরও চাই' করে নিজকে ক্লান্ত করে ফেলেছি। অপরদিকে মুসলিম রাষ্ট্রের প্রশাসকরা তো ভোগের সাগরের প্রমোদতরিতে উল্লাসে রত।

এমতাবস্থায় খলিফা আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর অনাড়ম্বর জীবন হোক আমাদের সকলের জন্য সুবহে সাদিকের আলো।

- **খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ(رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)**

খাদিজা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা হলেন আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রথম সহধর্মিণী এবং রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর প্রথম ঈমান আনয়নকারী। ইসলামের সূচনা লগ্নে তিঁনি ছিলেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরামর্শদাত্রী ও সাহায্যকারিণী। সাত আসমানের উপর হতে মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তিঁনি সালামপ্রাপ্ত হন। তাঁকে জান্নাতে মণি-মুক্তার তৈরি এমন একটি বাড়ির সুসংবাদ দেওয়া হয়-যাতে থাকবে না কোনো চিৎকার-শোরগোল এবং ক্লান্তি বা কষ্টের লেশ। খাদিজা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা কেবল সকল মুমিনদেরই জননী নন; বরং তিঁনি সকল মর্যাদা, গুণ ও শ্রেষ্ঠত্বেরও জননী।

তিঁনি দুনিয়াতে থাকতেই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তা হন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাঁর প্রশংসা করেছেন। সকল উম্মুল মুমিনীনের মধ্যে তিঁনি সবার শ্রেষ্ঠ।

খাদিজা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিলেন। বুদ্ধিময়া ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে তিঁনি ঈমান আনেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি। অনুসরণ করতে থাকেন নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব কাজ ও আমল-ইবাদত।

তিঁনি ছিলেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রথম সহধর্মিণী। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রশংসা করেছেন এবং অন্য বিবিগণের উপর তাঁর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পূর্বে এবং তাঁর জীবদ্দশায় দ্বিতীয় আর কোনো বিয়ে করেননি। তিঁনি রাসূল এর একাধিক সন্তানের জননী ও সর্বোত্তম জীবনসঙ্গিনী। উম্মুল মুমিনীন আ'য়িশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদিজা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর জীবদ্দশায় কাউকে বিয়ে করেননি।' [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৩৬]

খাদিজা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা পঁচিশ বছর প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সান্নিধ্যে কাটান। তিঁনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে প্রত্যুষে দুই রাকাত আর রাতে দুই রাকাত নামায পড়তেন। খাদিজা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা ফরয নামাযের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে ইন্তেকাল করেছিলেন। মক্কায় প্রথম খাদিজা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা-কেই রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাফন করার জন্য কবরে নামেন।

আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিঁনি বলেন, জিবরাঈল আলাইহিসসালাম রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট হাজির হয়ে বললেন-
يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَأَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ
"হে আল্লাহর রাসূল, ওই যে খাদিজা (রদ্বিয়াল্লাহু আনহা) একটি পাত্র হাতে নিয়ে আসছেন। ওই পাত্রে তরকারি, অথবা খাদ্যদ্রব্য অথবা পানীয় ছিল। যখন তিঁনি পৌঁছে যাবেন তখন তাকে তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এবং আমার পক্ষ থেকেও সালাম জানাবেন আর তাঁকে জান্নাতের এমন একটি ভবনের খোশ খবর দিবেন-যার অভ্যন্তর ভাগ ফাঁকা-মোতি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। সেখানে থাকবে না কোনো প্রকার শোরগোল; কোনো প্রকার দুঃখ-ক্লেশ।" [মুত্তাফাকুন আলাইহি; সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৮২০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৩২।]
আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, সমগ্র নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারইয়াম হলেন সর্বোত্তম আর নারীদের সেরা হলেন খাদিজা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা। [মুত্তাফাকুন আলাইহি। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৩২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৩০]

- **আ'য়িশা বিনতে আবু বকর(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)**

হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন রাসূল (সাঃ) এর সর্বকনিষ্ঠ স্ত্রী। তাঁর উপাধি ছিল 'সিদ্দিকা' (সত্যবাদী)

জ্ঞান সাধনা ও শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে উম্মুল মুমিনীন আ'য়িশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা কে নারী শিক্ষার অগ্রদূত বলা যায়। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা হয়েছে নবুয়তের মাদ্রাসায়। শৈশব কেটেছে ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দীক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর অভিভাবকত্বে ও যৌবন কেটেছে মানব সভ্যতার সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষক, নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তত্ত্বাবধানে। ইমাম যুহরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

'উম্মুল মুমিনীন আ'য়িশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা ও সব মহিলার ইলম একত্র করা হয়, আয়েশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর ইলমই সর্বাধিক হবে।'

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তাঁর সাত বছর বয়সে বিয়ে হয় ও নয় বছর বয়সে তিঁনি স্বামী গৃহে গমন করেন। তিঁনি ছিলেন নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী এবং সর্বাধিক প্রিয় স্ত্রী।

নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আম্মাজান আ'য়িশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর সুউচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থান ছিল। তাঁর মান-মর্যাদার বর্ণনা দিতে গিয়ে ইমাম যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ছাড়া আর আর কোনো কুমারী নারী বিয়ে করেননি এবং তাঁর মতো আর কাউকে ভালোবাসেননি। এটা আমরা দেখতে পাই আমর ইবনুল আস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর এক বর্ণনা থেকে–তিনি একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, মানুষের মধ্যে কে আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয়? তিঁনি বললেন, আ'য়িশা। আমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, পুরুষদের মধ্যে কে? তিঁনি বললেন, তাঁর পিতা।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আ'য়িশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর বিছানায় থাকতেন তখনো ওহি নাযিল হতো। একবার রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ

"(আমার কাছে অনিচ্ছাকৃত ব্যাপারসমূহ সম্পর্কে জানতে চেয়ে) আ'য়িশা সম্পর্কে কষ্ট দিয়ো না। কারণ, নিঃসন্দেহে আমার উপর আ'য়িশার বিছানা ছাড়া অন্য কারও বিছানায় ওহী অবতীর্ণ হয়নি।" [সহীহ বুখারী, ২৩৯৩; সহীহ মুসলিম, ৪৪৭১; সুনানে তিরমিজী, ৩৮১৪]

ইফকের ঘটনার পর আ'য়িশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ রটনা করা হলে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে আ'য়িশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর নির্দোষিতা ও নিষ্কলুষতা সংক্রান্ত পূর্ণ ১০ আয়াত নাজিল করেন। এছাড়াও এক সফরে আ'য়িশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর গলার হার হারিয়ে গেলে তা খোঁজার জন্য সবাই থেমে যায় আর সে স্থানের নিকটে কোনো পানি ছিল না আল্লাহ তা'আলা তখন তায়াম্মুমের আয়াত নাজিল করেন।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আ'য়িশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মুখের লালার সাথে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখের লালা মিলেছে, ও তাঁর ঘরেই নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কবর দেওয়া হয়েছে।

আ'য়িশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলতেন- "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে আমার বারির দিনে এবং আমারই বুকে ইন্তেকাল করেন। জীবনের একেবারে অন্তিম মুহর্তে আবদুর রহমান ইবনে আবি বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু একটি কাঁচা মিসওয়াক হাতে করে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখতে আসেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মিসওয়াকটির দিকে বার বার তাকাতে লাগলেন। বুঝলাম, তিঁনি সেটা চাচ্ছেন। আমি সেটা নিয়ে ধুয়ে নিজে চিবিয়ে নরম করে তাঁকে দিলাম। তিঁনি সেটা দিয়ে সুন্দর করে মিসওয়াক করলেন। তারপর আমাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য হাত বাড়ালেন, কিন্তু হাতটি পড়ে গেল। তিঁনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। সেই মহান আল্লাহর প্রশংসা যিনি তাঁর রাসূলের পার্থিব জীবনের শেষ মুহূর্তটিতে তার ও আমার থুতু মিলিত করেছেন।" [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১/১৮৯]

আ'য়িশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা শরীয়াতের এক চতুর্থাংশ জ্ঞান বহন করেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা উম্মা'হাতুল মু'মিনীনদের উদ্দেশ্য করে বলছেন-

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًاخَبِيرًا

"আর তোমাদের ঘরে আল্লাহর যে, আয়াতসমূহ ও হিকমত পঠিত হয়-তা তোমরা স্মরণ রেখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।" [সূরা আল-আহযাব: ৩৪]

হযরত আ'য়িশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এত বেশি যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের তথা সকল মহিলা সাহাবীদের শুধু নন হাতে গোনা চার-পাঁচজন পুরুষ সাহাবী ছাড়া আর কেউই তাঁর সমকক্ষতা দাবি করতে পারেন না।

তাবেয়ীদের ইমাম বলে খ্যাত হযরত ইমাম যুহরী-যিনি একাধিক অতি মর্যাদাবান সাহাবীর তত্ত্বাবধানের লালিত-পালিত হন। তিনি বলেন- "হযরত আ'য়িশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলিম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনেক

বড় বড় সাহাবী তার কাছে জানতে চাইতেন।” [মুসতাদরাকে হাকিম, ৪/১১]

উরওয়া ইবনে যুবাইর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন- “আমি হালাল-হারাম, জ্ঞান, কবিতা ও চিকিৎসা বিদ্যায় উম্মুল মুমিনীন আ'য়িশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা অপেক্ষা অধিকতার পারদর্শী অন্য কাউকে দেখিনি।” [তাবাকাতে ইবনে সাআদ, ৭/৩৯-৫৬]

■ ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)

ফাতিমা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা–তিঁনি ছিলেন কনিষ্ঠা নবীকন্যা। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে সবচেয়ে বেশি স্নেহের ও প্রিয় কন্যা ছিলেন ফাতিমা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা।

ফাতিমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর মহত্ত্ব, মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য অনেক। নবী পরিবারের মধ্যে আরও মর্যাদাবান ব্যক্তি আছেন কিন্তু তাদের মাঝে ফাতিমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহা অবস্থান এক বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থানে। সূরা আহযাবের আয়াতে তাতহীর (পবিত্রকরণের আয়াত) এর নুযূল ফাতিমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করেন।

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“হে নবী-পরিবার, আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।” [সূরা আল-আহযাব: ৩৩]

ফাতিমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর ব্যক্তিত্বের প্রতি যে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয়েছে তা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই হাদীসে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে- ‘পৃথিবীর নারীদের মধ্যে তোমার অনুসরণের জন্য মারইয়াম, খাদীজা, ফাতিমা ও ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া যথেষ্ট।’ [সুনানে আত-তিরমিযী, ৩৮৭৮; মুসতাদরাকে হাকিম, ৩/১৫৫]

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা জান্নাতীদের সর্দার ফাতিমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহা নবীজি(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ইন্তেকালের ছয় মাস পরেই মারা যান। আর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা যাওয়ার পর নবী পরিবারের মধ্যে তিঁনিই প্রথম মারা যান, যা নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যের পূর্বেই ফাতিমা

রদ্বিয়াল্লাহু আনহা কে জানিয়ে ছিলেন।

ফাতিমা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে যেয়ে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি বলেছেন বলেন–'ফাতিমা আমার শরীরের অংশ। যে তাকে কষ্ট দিবে, সে আমাকে কষ্ট দিবে।'

ইসলামী ইতিহাসে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদাপূর্ণ অবদান

সাহাবায়ে কেরাম (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) তাঁরা ছিলেন ইসলামের ইতিহাস নির্মাতারা, দ্বীনের ধারক ও বাহক। তাঁদের ত্যাগ, জ্ঞান, জিহাদ, প্রশাসন ও দাওয়াহ কার্যক্রমের মাধ্যমে ইসলাম বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হয়েছে।
নবীজি ﷺ দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর উম্মাহর নেতৃত্ব, আইন, প্রশাসন, শিক্ষা, বিচার—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সাহাবাদের অবদান অপরিসীম।
ইসলামী ইতিহাসে তাঁদের বহুমাত্রিক মর্যাদাপূর্ণ অবদান থেকে খুবই সামান্য কিছু তুলে ধরা হলো ইন শা আল্লাহ।

- **কুরআন সংরক্ষণে অবদান**

নবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় কুরআন নাজিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহাবীরা তা মুখস্থ ও লিখে রাখতেন। হযরত জায়েদ ইবন সাবিত রদ্বিয়াল্লাহু আনহু, উবাই ইবন কা’ব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ ছিলেন কুরআন সংগ্রাহক ও ক্বারী সাহাবী।

খলিফা হযরত আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু -এর সময়ে ইয়ামামাহ্‌র যুদ্ধের ময়দানে বহু হাফেজ সাহাবী শহীদ হলে, উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রস্তাবে কুরআন একত্রিত করে একটি সংকলন তৈরি করা হয়। [সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৯৮৬]

এরপর হযরত উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু কুরআনের একাধিক কপি লিখিয়ে তা বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করেন — ফলে কুরআন আজ পর্যন্ত বিকৃতি মুক্ত রয়ে গেছে।
মহান আল্লাহ তা'আলা এভাবে সাহাবীদের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত কুরআনকে অবিকৃত

অবস্থায় পৌছে দিয়েছেন।

■ হাদীস সংরক্ষণে অবদান

রাসূল ﷺ-এর বাণী, কাজ ও অনুমোদন সংরক্ষণে সাহাবারা অসাধারণ ভূমিকা রাখেন। আবদুল্লাহ ইবন উমার, আবু হুরায়রা, আ'য়িশা , আনাস ইবন মালিক রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা প্রমুখ সাহাবীরা হাজার হাজার হাদীস মুখস্থ রাখতেন এবং পরবর্তী প্রজন্মে তা প্রচার করেন।

সাহাবীরা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন, যেন কোনো ভ্রান্তি না ঘটে। এ বিষয়ে সমস্ত সাহাবী মাহফুজ ছিলেন, ছিলেন খুবই সচেতন ও সর্বোচ্চ আমানতদার। নবীজি ﷺ-এর সাহাবারা ছিলেন হাদীসের সবচেয়ে বড়ো রক্ষক। কেননা, তাঁরা এর ভয়াবহতা সম্পর্কে ছিলেন পূর্ণ ওয়াকিবহাল। লক্ষাধিক সাহাবীর মধ্যে সাধারণ একজন সাহাবীও এমন পাওয়া যায়নি, যিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের আমানত খিয়ানত করেছেন অথবা কিছু সংযোজন-বিয়োজন করেছেন। এই বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। এ মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই সাহাবীদের হাতে দ্বীন অবিকৃত অবস্থায় ছিল এবং তা দুনিয়ার কাছে অবিকৃত অবস্থায় পৌঁছে গেছে।

ইমাম যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:
“যদি সাহাবীরা হাদীস বর্ণনা না করতেন, তবে নবীর বাণী ইতিহাসে হারিয়ে যেত।”
[সিয়ারু আ’লামিন নুবালা, খণ্ড ১]
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে তাঁর হাবীব নবীয়ে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণীগুলো মাহফুজ রেখেছেন।

■ দাওয়াহ ও ইসলামের প্রচারে অবদান

নবী ﷺ-এর ইন্তেকালের পর সাহাবারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামের বার্তা প্রচারে ছড়িয়ে পড়েন।

* হযরত মু’আয ইবন জাবাল রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইয়েমেনে গিয়েছিলেন ইসলামী শিক্ষা প্রচারে।

* হযরত বিলাল রদ্বিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ায় গিয়ে আজান ও দাওয়াহ চালিয়ে যান।
* হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইসলামী বিজয়ের মাধ্যমে রোমান ও পারস্য অঞ্চলে ইসলামের পতাকা উড়ান।

এভাবে আরও অসংখ্য অসংখ্য সাহাবাদের দাওয়াহ প্রচেষ্টায় আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ পর্যন্ত ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এতো এতো লক্ষাধিক সাহাবীদের মধ্যে মাত্র কয়েক হাজার সাহাবীদের কবর মক্কা মাদীনাতে, তাহলে মনে প্রশ্ন জাগে বাকীরা কোথায়! অবশ্যই বাকীরা সবাই দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলো দ্বীন ইসলাম প্রচার করার লক্ষ্যে। ইসলামের জন্য অকাতরে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন; প্রাণের শহর, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহর তাঁরা ছেড়ে গিয়েছেন যেখানে আমরা আমাদের ভিটেমাটি টা ছাড়ার কথা চিন্তা করলেই কলিজা ছিড়ে যাবে এমন অবস্থা। তাঁদের এই অবদানেই আজ সুদূর এই বাংলাদেশে আমরা ইসলাম পেয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ!

- **প্রশাসন ও নেতৃত্বে অবদান**

সাহাবারা ইসলামী শাসনব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেন। সাহাবীদের প্রশাসন ও নেতৃত্বে অবদান ছিল বহুমুখী, যার মধ্যে রয়েছে মুসলিম সম্প্রদায়কে সংগঠিত করা, সুশৃঙ্খল সমাজ গঠন করা এবং ন্যায়পরায়ণ শাসন প্রতিষ্ঠা করা। তাঁরা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা অনুযায়ী নেতৃত্ব, পরিকল্পনা এবং সমন্বয় সাধনে পারদর্শী ছিলেন এবং ইসলামের শিক্ষা ও প্রচারের ওপর জোর দেন।

* হযরত আবু বকর (রা.)—ইসলামী খেলাফতের প্রথম খলিফা; তাঁর প্রশাসনিক নীতি ছিল আল্লাহভীতি ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।
* হযরত উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু —ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার সংগঠক; তিঁনি বিচার, অর্থনীতি, ডিপার্টমেন্ট, ডাকব্যবস্থা, পুলিশ, সেনাবাহিনী, বাজার নিয়ন্ত্রণ—সব কিছুর ব্যবস্থা করেন।

* হযরত উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু—কুরআন সংরক্ষণ ও প্রশাসনিক একতা প্রতিষ্ঠা করেন।
* হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু—ইলম ও বিচার ব্যবস্থার সংস্কার করেন।

এই চার খলিফার যুগকে ইসলামী ইতিহাসে বলা হয় "খুলাফায়ে রাশিদুন", যা সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থার আদর্শ রূপ।

■ **শিক্ষা ও জ্ঞানের বিকাশে অবদান**

সাহাবারা শুধু দাওয়াহ নয়, ইসলামী জ্ঞান ও ফিকহের ক্ষেত্রেও ভিত্তি স্থাপন করেন। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু কুফা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যা থেকে পরবর্তীতে ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মত মহামানব জন্ম নেন। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাফসীরের জনক হিসেবে পরিচিত; তাঁর শিষ্যরাই ইসলামী তাফসীর বিজ্ঞানের ভিত্তি গড়ে তোলেন। [তাফসীর ইবন কাসীর, ভূমিকা]

■ **সমাজ সংস্কারে অবদান**

সাহাবারা জাহিলিয়াত যুগের অন্যায়, নারীর প্রতি অবিচার, মদ্যপান, সুদ, মিথ্যা, অন্যায় যুদ্ধ—এসব বিলুপ্ত করে ইসলামী সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলেন।
তাঁরা আল্লাহভীতিপূর্ণ, ন্যায়ের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনা করেন।

■ **সাহাবাদের ঐক্য ও পরস্পরের ভালোবাসা**

সাহাবাদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও তারা দ্বীনের স্বার্থে একে অপরকে ভালোবাসতেন, সম্মান করতেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ

অর্থ: "আমি তাদের অন্তর থেকে বিদ্বেষ তুলে নিয়েছি, তারা পরস্পর ভাইয়ের মতো মুখোমুখি বসবে।" [সূরা আল-হিজর, আয়াত ৪৭]

সাহাবায়ে কেরামের অবদানই ইসলামের ইতিহাসের ভিত্তি। কুরআন ও হাদীস সংরক্ষণ, দাওয়াহ, খেলাফত, শিক্ষা, সমাজ সংস্কার—প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান অপরিমেয়। তাঁরা না থাকলে আজ ইসলাম আমাদের কাছে এভাবে পৌঁছাত না। তাঁদের ত্যাগ, জ্ঞান ও কর্মই উম্মাহর জন্য এক অমলিন ঐতিহ্য।

সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে সমালোচনা না করার বিধান

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবাগণের মর্যাদা ও ফযীলত কুরআন ও হাদীসের মাঝে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন বা হাদীসে কোথাও

সাহাবাগণের মাঝে ভাল মন্দের কোন পার্থক্য করা হয়নি। বরং সকলকেই হক ও হক্কানিয়্যাতের প্রতিচ্ছবি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এখানে সংক্ষিপ্তাকারে সাহাবায়ে কেরামের নিয়ে সমালোচনা না করা সম্পর্কে উল্লেখ করা হচ্ছেঃ

১।

عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا

হযরত সাওবান রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন। যখন আমার সাহাবীদের আলোচনা আসে, তখন [তাদের ব্যাপারে সমালোচনা করা থেকে] নিজেকে বিরত রাখো। [আলমু'জামুল কাবীর লিততাবরানী, হাদীস নং-১৪২৭]

জালালুদ্দীন সুয়ুতী রহঃ এ হাদীসকে হাসান বলেছেন। [আলজামেউস সাগীর, বর্ণনা নং-৬১৩]

২।

ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً، خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ

ইবনে উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমরা মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণের সমালোচনা করো না, তাঁদের এক মুহুর্তের সৎকাজ তোমাদের সারা জীবনের সৎকাজের চেয়ে উত্তম। [সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-১৪৬, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং-৩৩০৮২]

৩।

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُمِرُوا بِالِاسْتِغْفَارِ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبُّوهُمْ

হযরত আ'য়িশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত– তিঁনি বলেন: নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণের ব্যাপারে ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ করা করা হয়েছে, অথচ লোকেরা তাদের সমালোচনা করছে। [মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং-৩৩০৮৫, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৩০২২, মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন, হাদীস নং-৩৭১৯]

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা একথা পরিস্কার প্রমাণিত যে, সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে সমালোচনা বা খারাপ মন্তব্য নয়, বরং তাদের জন্য ইস্তিগফার এবং প্রশংসনীয় মন্তব্য করাই রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তামান্না ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা অনেকেই তা লঙ্ঘণ করছি। আল্লাহ তা'আলা হিফাযত করুন।

৪।

عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ

হযরত আত্বা রহঃ থেকে বর্ণিত–রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার সাহাবীর সমালোচনা করে, তার উপর আল্লাহর লানত। [মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং-৩৩০৮৬]

সাহাবা সমালোচনা এবং তাদের প্রতি কু-ধারণা পোষণকারীর হুকুম—

১।

وَقَالَ الْمَيْمُونِيُّ قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: يَا أَبَا الْحَسَنِ إِذَا رَأَيْتَ رَجُلًا يَذْكُرُ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ بِسُوءٍ فَاتَّهِمْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ.

মাইমুনী রহঃ বলেন, আমাকে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহঃ বলেছেন, হে আবুল হাসান! যখন তুমি দেখবে কোন ব্যক্তি সাহাবাগণের মাঝে কোন সাহাবীর ব্যাপারে সমালোচনা করছে, তাহলে তুমি বুঝে নিও তার ঈমান ও ইসলামে খাদ আছে। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৪৮, ১৪৯, ইফাবা-৮/২৬৫]

২।

وَقَالَ الْفَضْلُ بن زياد: سمعت أبا عبد الله يسأل عَنْ رَجُلٍ تَنَقَّصَ مُعَاوِيَةَ وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أيقال له رافضي؟ فقال: إنه لم يجترئ عَلَيْهِمَا إِلَّا وَلَهُ خَبِيئَةُ سُوءٍ، مَا انْتَقَصَ أحد أحداً من الصحابة إِلَّا وَلَهُ دَاخِلَةُ سُوءٍ.

ফজল বিন যিয়াদ হযরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহঃ থেকে শুনেছেন। তাকে একজন প্রশ্ন করল এমন ব্যক্তির ব্যাপারে, যে হযরত মুয়াবিয়া রাঃ এবং হযরত আমর বিন আস রাঃ এর ব্যাপারে মন্দ বলে। লোকটিকে কি রাফেজী বলা হবে?

তখন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহঃ বললেন, অন্তর কলুষিত এবং খারাপ উদ্দেশ্য ছাড়া সে দু'জনের প্রতি এ দুঃসাহস দেখায়নি। আর অসৎ উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ কোন সাহাবীর সমালোচনা করেনি। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৪৮, ১৪৯, ইফাবা-৮/২৬৫]

সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে সমালোচনা করবে সে মুলহিদ এবং বে-দ্বীন। ইসলামের দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী। যদি সে ব্যক্তি তওবা না করে তাহলে তার একমাত্র সমাধান তলোয়ার। [উসূলে সারাখসী-২/১৩৪]

৩। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহঃ লিখেছেনঃ

ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب قبل منه وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده الحبس حتى يموت أو يراجع

চারজন খলীফায়ে রাশেদের পর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত সাহাবা রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম খাইরুন নাস। তাদের ব্যাপারে সামান্য খারাবী বর্ণনা করাও কারো জন্য

জায়েজ নয়। কোন একজন সাহাবীর দোষ এবং ক্রুটি বর্ণনা করার সুযোগ নেই। যদি কোন ব্যক্তি এ কাজ করে, তাহলে শাসকের দায়িত্ব হল, তাকে শিক্ষা দেয়া এবং তাকে শাস্তি দেয়া। তাকে ক্ষমা করা যাবে না, বরং তাকে শাস্তি দিতে হবে। যদি সে তওবা করে, তাহলে তার তওবা গ্রহণ করা হবে। যদি সে তওবা না করে সমালোচনার উপর অটল থাকে, তাহলে তাকে দ্বিতীয়বার আবার কড়া শাস্তি দিতে হবে এবং তাকে আজীবনের জন্য বন্দী করবে যতক্ষণ না সে মারা যায় বা তওবা করে। [আসসারেমুল মাসলূল আলা শাতিমির রাসূল-৫৭৩, ৫৬৮]

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারলামঃ

১। সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম এর ব্যাপারে সুধারণা রাখতে হবে। কুধারণা করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।
২। সাহাবায়ে কেরাম এর ব্যাপারে যে ব্যক্তি খারাপ মন্তব্য করবে বা সমালোচনা করবে তার ইসলাম সন্দেহযুক্ত, শরীয়তে তার দ্বীনের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।
৩। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং আমর বিন আস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ব্যাপারে সমালোচনাকারী ব্যক্তি কুধারণার স্বীকার এবং তার অন্তর নোংরামীতে ভরপুর।
৪। হযরত উমার বিন আব্দুল আজীজের মত ন্যায়পরায়ন শাসক পর্যন্ত হযরত মুয়াবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ব্যাপারে সমালোচনাকারীকে চাবুক মারতেন। যেন উক্ত ঘৃণিত কাজ থেকে ফিরে আসে এবং ভবিষ্যতে এ কাজ করার সাহস না পায়।
৫। যে কোন সাহাবীর ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাকে তওবা করানো হবে। যদি তওবা না করে তাহলে তাকে আজীবনের জন্য বন্দী করা হবে। তওবা করলে মুক্তি মিলবে নতুবা মৃত্যু পর্যন্ত বন্দীত্বের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা অবমাননার পরিণতি ও আধুনিক যুগে এর প্রভাব

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ঈমানের অংশ এবং ইসলামী ইতিহাসে তাদের অবদান অপরিসীম। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সাহাবাদের প্রতি অবমাননা বা বিদ্বেষ অনেক ক্ষতি ডেকে এনেছে—না শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ঈমানের ক্ষেত্রে, বরং উম্মাহর ঐক্য ও সমাজের স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রেও। আধুনিক যুগেও বিভিন্ন ফিতনা ও বিভ্রান্তির ফলে সাহাবাদের

মর্যাদা হ্রাস পেতে পারে। এই অধ্যায়ে আমরা তাদের প্রতি অবমাননার পরিণতি এবং আধুনিক যুগে এর প্রভাব তুলে ধরা হলো:

■ কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে সতর্কবার্তা

কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে—আল্লাহ তা'আলা সাহাবাদের প্রশংসা করেছেন, তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, তাঁদের তাওবা কবুল করেছেন, তাঁদের মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম ঘোষণা করেছেন।
সুতরাং তাঁদের অবমাননা বা গালি দেওয়া কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশের বিরোধিতা।
আবদুল্লাহ ইবনে উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-
إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُوْلُوْا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ .
“যারা আমার সাহাবিদের গালমন্দ করে, তাদের তোমরা বলবে-তোমাদের দুষ্কর্মের ওপর আল্লাহর লানত।” [তিরমিযি: ৩৮৬৬]
অর্থাৎ, সাহাবাদের অবমাননা সরাসরি শাস্তির কারণ হতে পারে।
এছাড়াও অনেক হাদীসে এসেছে– সাহাবাদের গালি না দেওয়ার ব্যাপারে, তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ নিফাকের আলামত, সাহাবাদের কষ্টদাতার উপর লানত, সাহাবাদের বিষয়ে নীরব থাকো ইত্যাদি।

সুতরাং সাহাবা অবমাননা ভয়াবহ গুনাহ এবং নিফাকি-স্বভাবের লক্ষণ।

■ ইসলামী ইতিহাসে অবমাননার প্রভাব

ইতিহাসে দেখা যায়, সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষ ও সমালোচনা বিভিন্ন ফিতনার উৎস হয়েছে। খারেজি ও রাফেযি দল সাহাবাদের মধ্যে কিছু বিদ্বেষী মতবাদের ভিত্তিতে বিদ্বেষ তৈরি করেছিল। এর ফলে মুসলিম উম্মাহ বিভক্ত হয়েছিল, যা পরবর্তীতে অনেক রাজনৈতিক ও সামরিক সংঘাতের কারণ হয়েছিল।
ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “সাহাবাদের সমালোচনা ও বিদ্বেষ ইসলামের প্রথম শতাব্দীর ফিতনার মূল ছিল।” [তাফসীর তাবারী, খণ্ড ২]

■ আধুনিক যুগে প্রভাব

আধুনিক সমাজে কিছু ব্যক্তিরা বিভ্রান্তি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাহাবাদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছে। এর ফলে মুসলিম সমাজে বিভাজন দেখা দেয়। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস দুর্বল হয়। ইসলাম ও নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শিক্ষার প্রতি বিভ্রান্তি তৈরি হয়।
ইমাম শফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "যে সম্প্রদায় সাহাবাদের মর্যাদা বজায় রাখে, তারা ইসলামের মূল ভিত্তি রক্ষা করে; আর যারা অবমাননা করে, তারা ঈমান ও সমাজের ক্ষতি করে।"

■ সমাধান ও প্রতিরোধ

* সঠিক শিক্ষা ও ইতিহাসের প্রচার: ইসলামী স্কুল, মাদ্রাসা ও পরিবারগুলো তরুণদের সাহাবাদের মর্যাদা ও নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে।

* উম্মাহর ঐক্য বজায় রাখা: বিভাজন ও বিদ্বেষের চক্র বন্ধ করতে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা ও নেতা-উলামাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা জরুরি।

* ধর্মীয় বিভ্রান্তি থেকে সাবধান: সামাজিক মাধ্যম ও বইপত্রে ভুল তথ্য ছড়ানো হলে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

সাহাবাদের মর্যাদা অবমাননা শুধুমাত্র অতীতেই ক্ষতি করেছে না, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মুসলিম উম্মাহর জন্যও হুমকি সৃষ্টি করছে। তাই সঠিক শিক্ষা, সচেতনতা, এবং ঐক্য রক্ষার মাধ্যমে আমরা সাহাবাদের মর্যাদা রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে এবং ঈমান ও ইসলামের অখণ্ডতা নিশ্চিত করতে হবে।

মুশাজারাতে সাহাবা

সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতপার্থক্য হয়েছে। প্রকাশ্য যুদ্ধ পর্যন্ত ঘটেছে। কিন্তু উলামায়ে উম্মত সাহাবীদের আদব রক্ষার্থে সেই যুদ্ধকে 'যুদ্ধ' বা 'লড়াই' নামে আখ্যায়িত করা উচিত মনে করেননি। তারা একে আখ্যায়িত করেন 'মুশাজারাহ' নামে। যার অর্থ শাখাবহুল গাছ বা বহু ডাল-পালা বিশিষ্ট বৃক্ষ। যার একটি ডাল অন্য ডালের মধ্যে ঢুকে পড়ে, একটির সঙ্গে অন্যটির টক্কর লাগে যা গাছের জন্য দোষণীয় নয়, ক্ষতিকরও নয়।

মুশাজারাতে সাহাবার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা হলো, উভয়পক্ষের প্রতিই ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখা ওয়াজিব। কোনো পক্ষকেই মন্দ বলা হারাম।
উম্মতের ইজমা রয়েছে এ বিষয়েও যে, 'জামাল' (উটের) যুদ্ধে আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মত সঠিক। তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল ভুলের উপর।
একইভাবে সিফফীন যুদ্ধেও হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন হকের ওপর আর প্রতিপক্ষ হযরত মুআবিয়া এবং তাঁর সহযোগীরা ছিলেন ভুলের উপর। অবশ্য তাঁদের ভ্রান্তিকে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'ইজতেহাদী খতা' রূপে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে 'গুনাহ' নয় (সুতরাং শাস্তিরও প্রশ্ন নেই) বরং ইজতেহাদের মূলনীতি হিসাবে পূর্ণচেষ্টার পরও ভুল হয়ে গেলে, ঐ ব্যক্তিও সাওয়াব থেকে মাহরুম হয় না। (সিদ্ধান্ত সঠিক হলে দুটো সাওয়াব, আর ভুল হলে) একটি সাওয়াব সেও পায়।
এভাবে একদিকে মুশাজারাতে সাহাবার ক্ষেত্রে 'সঠিক মত' ও 'ভুল মত' চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও আদব পূর্ণরূপে রক্ষা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিজের জবান ও ভাষাকে সংযত রাখতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লামা কুরতুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আহলুস সুন্নাহ এর নীতি-আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করে এই মুশাজারায়ে সাহাবা বিষয়ে আলোকপাত করেছেন এভাবে:

"রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত তালহা ও যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে 'আশারায়ে মুবাশারা' এর অন্তর্ভুক্ত বলে জানিয়ে ছিলেন, তাঁদের ব্যাপারে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যত বাণী ছিল, তাঁরা উভয়েই শহীদ হবেন। বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁরা হযরত উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার বদলা বা 'কেসাসে'র দাবিতে হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিপক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে শহীদ হয়েছিলেন। প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস তাঁদেরকে শহীদ আখ্যায়িত করেছে। পক্ষান্তরে হযরত

আম্মার ইবনে ইয়াসার হযরত আলী কাররামাল্লাহুর পক্ষে জোরালো তৎপরতা চালিয়ে যুদ্ধে অংশ নেন। পূর্ণ শক্তি দিয়ে হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিরোধীদের মুকাবেলা করেন। প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেও শহীদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।"

এক্ষেত্রে একজন মুমিনের প্রধান ভাবনার বিষয় প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যতবাণী, যা স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দেয়, হযরত তালহা ও যুবাইর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য লড়াই করেছিলেন, সে কারণেই তাঁরা দু'জনও শহীদ। একই সঙ্গে হযরত আম্মার রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছু ছিল না, সে কারণে তিনিও শহীদ এবং তিনিও প্রশংসার যোগ্য। উভয় দলের মতের ভিন্নতা কোনো পার্থিব গরজে ছিল না, ছিল ইজতেহাদ ও নেক ভাবনার ভিত্তিতে। ফলে কোনো দলকেই সমালোচনার আঘাতে জর্জরিত ও অসংযত ভাষায় আহত করা কোনোভাবেই বৈধ হতে পারে না। নিজের ঈমানকে নিরাপদ রাখতে চাইলে কুরআন সুন্নায় বর্ণিত সকল সাহাবীর ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়া এবং তাঁদের জন্য চিরস্থায়ী জান্নাত অবধারিত হওয়ার বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল করতে হবে। প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে নিজের জবান ও ভাষাকে সাহাবীদের ব্যাপারে সংযত করে অন্তরে তাঁদের প্রতি মুহাব্বত ও ভালোবাসা জাগ্রত রাখতে হবে। কুরআন ও হাদীসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ইতিহাস- যা সাহাবায়ে কেরামকে কোনোপ্রকার কালিমা লিপ্ত করে, সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে।

শেষ কথা

পরিশেষে আমরা দৃঢ়তার সাথে বলব যে, সাহাবীগণ হলেন আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী এবং নবী ও রাসূলগণের পরে আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে পছন্দনীয় ও প্রিয় মানুষ। আর ঈমানের দিক থেকে তাঁরা হলেন অগ্রগামী পূর্বপুরুষ এবং আর-রহমানের সন্তুষ্টি অর্জনকারী ব্যক্তিবর্গ। তাঁদেরকে মুহাব্বাত করাটা আনুগত্য ও ঈমান এবং তাঁদেরকে ঘৃণা করাটা নিফাকী ও সীমালংঘন। তাঁরা হলেন এ উম্মতের মধ্যে মনের দিক থেকে সবচেয়ে সুহৃদ ও সৎ মানসিকতাসম্পন্ন, ঈমানের দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী, জ্ঞানের দিক থেকে সবচেয়ে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন, সবচেয়ে কম আনুষ্ঠানিকতা প্রিয়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য ও সহযোগিতার দিক থেকে তাঁরা অনেক দূর এগিয়ে এবং তাঁদের জন্য আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যয়ন ও প্রশংসার দ্বারা তাঁর মহান মর্যাদায়

উপনীত হয়েছেন।
তাঁদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে সর্বোচ্চ অবস্থানে, পুরস্কারের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি এবং পরিমাপকের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী হলেন সিদ্দীকে আকবর আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু, তারপর হলেন 'ফারুক' নামে প্রসিদ্ধ উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু; আর এ ব্যাপারে সাহাবী ও তাবে'ঈন মুমিনগণের পক্ষ থেকে 'ইজমা' সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর যুন-নূরাইন উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু, তারপর আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু, যিঁনি বালকদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম ঈমান গ্রহণ করেছেন। আর তাঁরা হলেন খোলাফায়ে রাশেদীনের চারজন এবং সুপথপ্রাপ্ত ইমাম। আর তাঁদের পরবর্তী পর্যায়ের হলেন 'আশারায়ে মুবাশশিরীনের (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জনের) অবশিষ্ট ছয়জন। আর তাঁদের পেছনে রয়েছেন পুণ্যবান মুহাজিরগণের একেবারে প্রথম ধাপের অগ্রগামী দল। তারপর আছেন প্রথম শ্রেণির আনসারগণ। তার পরবর্তী স্তরে রয়েছেন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ, যারা পুরস্কারের অধিকারী এবং যাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ, যাঁরা আঘাতপ্রাপ্ত ও কঠিন পরিস্থিতির শিকার হওয়ার পরেও আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। অতঃপর 'বায়'আতে রিদওয়ান'-এ অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ, যাঁদের জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর যিঁনি মক্কা বিজয়ের পূর্বে ঈমান এনেছেন, আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন, হিজরত করেছেন এবং জিহাদ করেছেন। অতঃপর যিঁনি মক্কা বিজয়ের পরে ঈমান এনেছেন, আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন, হিজরত করেছেন এবং জিহাদ করেছেন। আর তাঁদের সকলের জন্যই রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিশ্রুতি।
সুতরাং প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর ফরয হলো তাঁদেরকে মুহাব্বত করা এবং তাঁদের সকলের ব্যাপারে (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলে) সন্তুষ্টি কামনা করা। আর যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ঘৃণা করে অথবা তাঁদের দুর্নাম করে এবং তাঁদের মন্দ সমালোচনা করে, তাকে ঘৃণা করা। আর যেমনিভাবে মর্যাদার ক্ষেত্রে তাঁদের মাঝে তারতম্য রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে তাঁদেরকে ভালোবাসার ক্ষেত্রেও পরিমাণগত তারতম্য হবে। আর তাঁদেরকে অনুসরণ করা এবং তাঁদের হিদায়াত বা নির্দেশনা দ্বারা হিদায়াত লাভ করার বিষয়টি নির্ধারিত হবে তাঁদের মর্যাদার ব্যাপারে কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি ছাড়া অথবা তাঁদের মর্যাদাকে কোনো রকম খাটো করা ছাড়া। সুতরাং (মনে রাখতে হবে) তাঁরা নিষ্পাপ নন তবে মাগফুর ক্ষমাপ্রাপ্ত এবং তারা অপরাপর মুমিনগণের কারো মতও নন।
আরও কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের মাঝে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার ব্যাপারে সমালোচনা করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকা এবং তাঁদের জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। সুতরাং শুধু তাঁদের ভালো ও সুন্দর বিষয়গুলোই আলোচনা করা যাবে, আর যে ব্যক্তি তাঁদের মন্দ সমালোচনা

করবে, সে পথভ্রষ্ট বলে গণ্য হবে এবং কঠিন শাস্তির মুখোমুখী হবে।

পরিশেষে আমাদের আবেদন আল-কুরআনের শিখানো ভাষায়:

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

“হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।” [সূরা আল-হাশর: ১০]

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ঐ ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত করুন, যে ব্যক্তি আপনার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে ভালোবাসে, তাঁদেরকে (অপবাদের অভিযোগ থেকে) রক্ষা করে, তাঁদের প্রশংসা ও গুণগান করে এবং তাঁদের জীবন পদ্ধতি অনুসরণ করে।

وصلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم.

তথ্যসূত্র (রেফারেন্স)

১। https://quranandsunna.com/library/sahabayekiramder-obosthan-o-morrzadar-bishoye-ahlesunnar-akidha/18232

২। https://www.hadithbd.com/hadith/detail/?book=12&section=303

৩। https://www.hadithbd.net/books/link/?id=7191

৪। https://www.alkawsar.com/bn/article/3064

৫। https://www.alkawsar.com/bn/article/3112

৬। https://www.islamland.com/bos/books/%E0%A6%B8-%E0%A6%B9-%E0%A6%AC-%E0%A7%9F-%E0%A6%95-%E0%A6%B0-%E0%A6%AE-%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%B8-%E0%A6%A5-%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%AE%E0%A6%B0-%E0%A6%AF-%E0%A6%A6-%E0%A6%B0-%E0%A6%AC-%E0%A6%B7%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%B2-%E0%A6%B8-%E0%A6%A8-%E0%A6%A8-%E0%A6%A4-%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%95-%E0%A6%A6-%E0%A6%AC-%E0%A6%B6-%E0%A6%AC-%E0%A6%B8-1449084745

৭। https://muslimbangla.com/article/889

৮। https://hasbiacademy.com/en/blog/143

বই সমূহ:

৯। সাহাবায়ে কিরাম আমাদের অনুপ্রেরণা –অধ্যাপক মফিজুর রহমান

১০। সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবন(১ম খন্ড)– ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা

১১। আজমতে সাহাবা(রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)– আলী হাসান উসামা

১২। মহীয়সী নারী সাহাবীদের আলোকিত জীবন–কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক